সেপ্টেম্বর ২০০৬ ● দশ টাকা

আনন্দমেলা

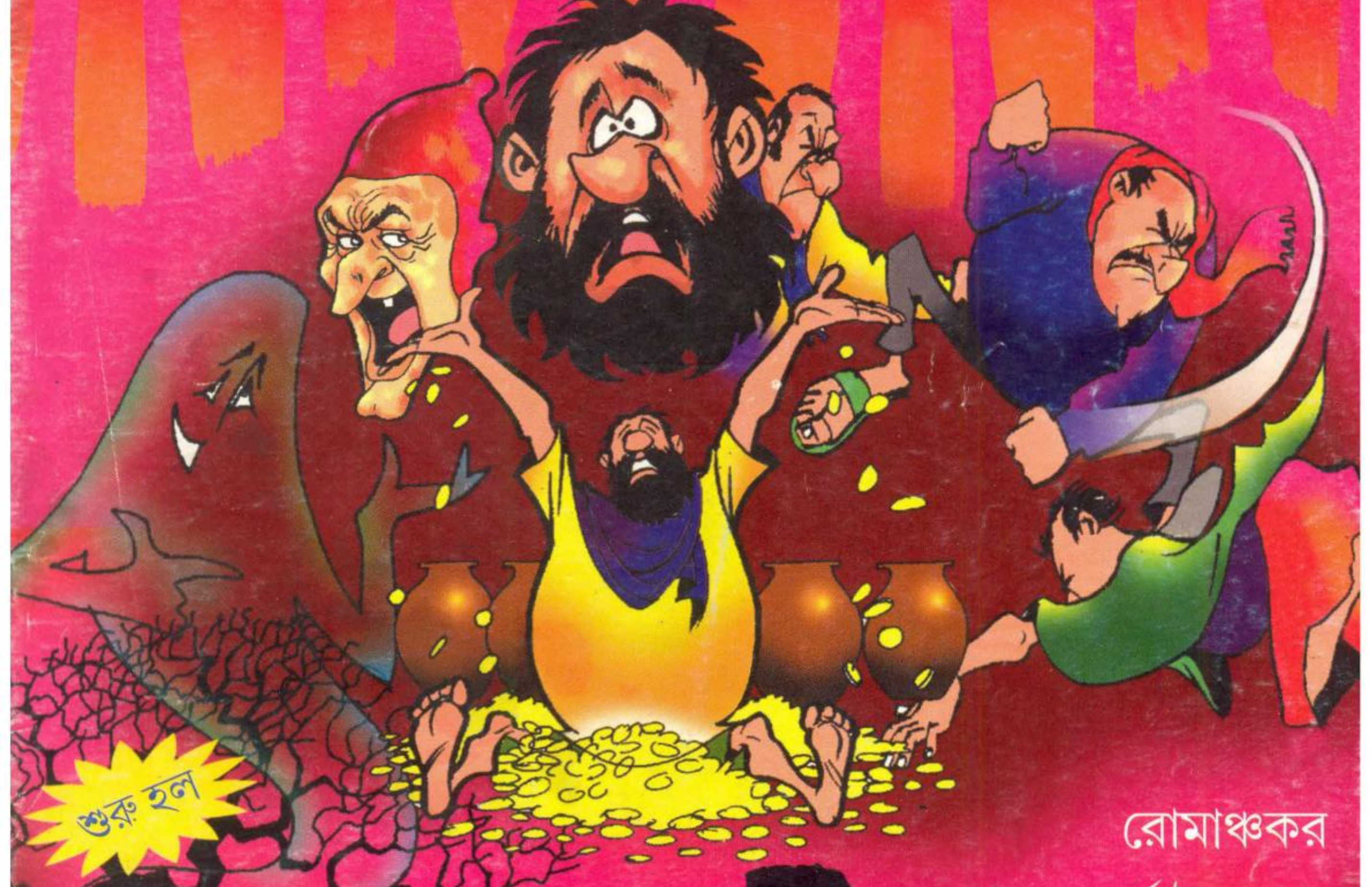

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

মজাদার গল্পের জমজমাট কমিক্‌স

বিপিনবাবুর বিপদ

রোমাঞ্চকর

সম্পূর্ণ উপন্যাস

কৃষ্ণলামার গুম্ফা

দুর্দান্ত দু'টি গল্প ● সাফ গেমসের সোনার মেয়েরা ● 'প্রিন্স অফ হ্যাটট্রিক' শ্রীশান্ত

আমরা জানি বাচ্চারা তরিতরকারী পুরোটা খায় না।
তাই, আমাদের পুষ্টি সম্পূরকে আমরা ভরে রেখেছি প্রকৃতির গুণাবলীকে।

এ প্রমাণিত। জৈবিক ভাবে ফলানো খাদ্যশষ্যে শ্রেষ্ঠতম পুষ্টিগত ফলাফল পাওয়া যায়। আর সেজন্যেই তো অ্যামওয়েতে, আমরা আমাদের খাদ্য সম্পূরক গুলিকে তৈরী করি একেবারে সরাসরি ক্ষেত থেকে আনা প্রকৃতি থেকে। আমরা যে সব উপাদান ব্যবহার করি সেগুলি ফলানো হয় আমাদের-নিজস্ব জৈবিক খামারে, যেখানে মাটি চাষ করে কেঁচো এবং গুবরে-পোকা জাতীয় পতঙ্গ কাজ করে কীটনাশকের। বস্তুত্, নিরাপদ এবং প্রাকৃতিক এই দুটি শব্দই আমরা উত্তরোত্তর বহন করে চলি আমাদের উৎপাদনের সমস্ত সম্ভারের গোড়ার কথা হিসেবে। আমাদের সংক্রমণ নিরোধক এবং হাউসহোল্ড ক্লীনার গুলিতে থাকে কেবলমাত্র ত্বক-নিরাপদ উপাদান। আমাদের ফ্লোর ক্লীনার গুলিতে থাকে পাঁচবার ফিল্টার করা জল যা সচরাচর ব্যবহার করা হয় কফ সিরাপে। আমাদের উৎপাদনগুলি সৃষ্টি করা হয় 500-এরও বেশি উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের দল দ্বারা। এ সব জিনিষ আপনি স্থানীয় মুদি-দোকানে কোনদিনই দেখতে পাবেন না। অ্যামওয়ের কোন দোকান নেই, নেই কোন দোকানদারও। আছেন একগুচ্ছ মানুষ, যাঁরা তাঁদেরই মত স্বমতাবলম্বী কিছু মানুষ কে তাঁদের গোষ্ঠীতে নিয়ে আসেন। আপনার মত মানুষদের। আরও বিশদ ভাবে আমাদের সম্বন্ধে জানতে লগ অন করুন www.amwayindia.com

CUSTOMER SATISFACTION 100% OR MONEY REFUNDED

Amway™
BETTER iDeaS. BETTER LiFe.

•Nutrition & Wellness •Cosmetics •Home Care •Personal Care •Insurance | www.amwayindia.com

আনন্দমেলা

৩২ বর্ষ ৫ সংখ্যা ভাদ্র ১৪১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬

কৃষ্ণলামার গুম্ফা ২৬

এক সংখ্যায় সমাপ্য রহস্য উপন্যাস

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে শুভমের বাবা-মা পাড়ি দিলেন সেখানে। শুভমের পাসপোর্ট করা হয়নি। তাই নীলাঞ্জনের কাছে তাঁরা শুভমকে রেখে গেলেন। বৌদ্ধ শিল্পকলা নিয়ে গবেষণার কাজে নীলাঞ্জনের সঙ্গে শুভমও গিয়ে হাজির হল গ্যাংটকে। সেখানে এক কিউরিও শপে একটা জিনিস দেখে শুভম সেটা নিতে চাইল। নীলাঞ্জনকাকু বলল, জিনিসটার নাম জপযন্ত্র। তারপর ওদের আলাপ হল কৃষ্ণলামার সঙ্গে। কী ঘটল তারপর?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মজাদার গল্পের জমজমাট রঙিন কমিক্স (প্রথমাংশ)

বিপিনবাবুর বিপদ ১৩

নফরগঞ্জের বিপিনবাবু যখন নিজের দুঃখের কথা ভাবেন, তখন তাঁর দু' চোখ ভরে জল আসে। এক শীতের রাতে তাঁর দরজায় রামভজন নামে একজন এসে হাজির। কিছুদিন ধরে রামভজন একজন কৃপণ লোককেই খুঁজছিলেন। তিনি জোর করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। এর পর আরও কৃপণ লোকের খোঁজ করতে-করতেই একদিন নফরগঞ্জের নবীন চোর চিতেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রামভজনের। মজাদার কমিক্সের প্রথমাংশ এ-সংখ্যায়। ছবি: স্বপন দেবনাথ।

অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৪

পাঠকের পাতা ১০

আশ্চর্য পৃথিবী ১১

বিজ্ঞানের টুকিটাকি ১২

ক্যাম্পাস ২৫

কুইজ় ৫৭

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো ৫৮

হাসছি দ্যাখো ৫৮

অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৫৯

নানারঙের রামধনু ৬০

কমিক হিরো ৬১

ঐতিহ্য ৬২

প্রচ্ছদ: স্বপন দেবনাথ

গল্প

পাখিবন্ধু ৬ সাধন দাস

ভ্যাকুয়াম ক্লাবের দুর্গা-প্যান্ডেল ৫০ দেবাশিস মিত্র

খেলাধুলো

'প্রিন্স অফ হ্যাটট্রিক' শ্রীশান্ত ৬৪ অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

সাফ গেমসের সোনার মেয়েরা ৬৫ ভাস্বতী ঘোষ

ফ্রিস্টাইল ৬৬ চন্দন রুদ্র

সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার**

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

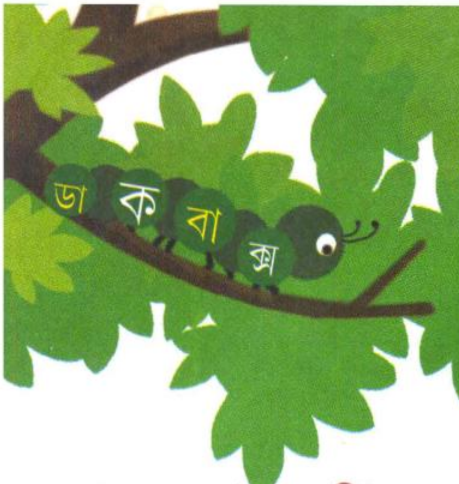

'নাঙ্গা পাহাড়ের মমি'-তে টিনটিনের গল্পের ছায়া

আমি 'আনন্দমেলা'র 'ডাকবাক্স' বিভাগে আগে অনেক চিঠি লিখেছি। সারা বছর আমরা 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা'র জন্য অপেক্ষা করে থাকি। অগস্ট সংখ্যায় সুখলতা মজুমদারের লেখা গল্প 'নাঙ্গা পাহাড়ের মমি'র সঙ্গে টিনটিনের একটি কমিক্সের মিল রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। টিনটিনের ওই কমিক্সটির নাম 'দ্য মিস্ট্রি অফ সেভেন ক্রিস্টালস' বাংলায়ও এই কমিক্সটি ছাপা হয়েছে, নাম 'মমির অভিশাপ'। টিনটিনের গল্পে একটি মমি কয়েকজন শহরে নিয়ে আসেন। এর পরই যারা মমিটি নিয়ে আসেন , তাঁদের প্রত্যেকেই ঘোরতর বিপদে পড়েন। টিনটিনের গল্পে ওই সব মানুষকে অনেকক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত। নাঙ্গা পাহাড়ের মমি গল্পে অবশ্য মমিটিই সবাইকে খুন করে। এর সঙ্গেই বলতে চাই যে, নাঙ্গা পাহাড়ের মমি গল্পটির শেষটিও আমার ভাল লাগেনি। এই সংখ্যায় 'গুপিচোরের কাণ্ড', 'ঝঞ্ঝাটপুরের চোর' এবং 'একশোয় একশো' ভাল লেগেছে।

কিশলয় মুখোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, সেন্ট ফ্রান্সিস এলিট স্কুল, কলকাতা
(ই-মেল-এর মাধ্যমে)

আমি নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি। অগস্ট সংখ্যায় 'ঝঞ্ঝাটপুরের চোর', 'গুপিচোরের কাণ্ড' গল্প দু'টি ভাল লাগল। 'শিকারবাড়ি রহস্য' উপন্যাসটিও বেশ ভাল। তবে 'নাঙ্গা পাহাড়ের মমি' গল্পটি একঘেয়ে লেগেছে। এই গল্পে মিস্টার কাপাডিয়া এবং মিস্টার ভট্টাচার্যের খুনি কে, তা বুঝতে পারলাম না। আনন্দমেলায় চাই আরও হাসির গল্প এবং ভূতের গল্প।

সোহম রানা
সপ্তম শ্রেণি, মকড়দহ বামাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন
(ই-মেল-এর মাধ্যমে)

শিবরাম কমিক্স দারুণ

জুলাই সংখ্যা 'আনন্দমেলা 'পড়লাম। আমি এই প্রথম পত্রিকাটি পড়লাম, ভাল লাগল। শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির কমিক্স 'আমার সম্পাদক শিকার' পড়ে খুবই ভাল লেগেছে।

কৌশিক গুপ্ত
প্রথম শ্রেণি, সারদা শিশুতীর্থ দেওয়ানগঞ্জ, কোচবিহার

অন্য উপহার

আমি পঞ্চম শ্রেণি থেকে 'আনন্দমেলা' পড়ি। 'পাঠকের পাতা' আমার অন্যতম প্রিয় বিভাগ। এই বিভাগের প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে সেরা তিনজনকে পুরস্কার হিসেবে টাকা না দিয়ে বই বা অন্য কোনও উপহার দিলে ভাল হয়। কারণ, টাকা তো আর স্মৃতি হিসেবে রাখা যায় না। এই বিষয় নিয়ে আপনারা চিন্তাভাবনা করবেন, আশা করি।

অর্ঘ্য কর
অষ্টম শ্রেণি, তেঁতুলিয়া হাই স্কুল, উত্তর চব্বিশ পরগনা

ফুটবলারদের পোস্টার চাই

আমি 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। জুন সংখ্যা আনন্দমেলা পড়ে দারুণ লাগল। 'রাপ্পা রায়ের কাণ্ড' কমিক্সটি এককথায় দারুণ! এ ধরনের কমিক্স আরও ছাপলে ভাল লাগবে। 'ফ্রিস্টাইল' বিভাগ দু' পাতার হলে ভাল হয়। আনন্দমেলায় প্রতি সংখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলারদের পোস্টার ছাপা হলে খুশি হব।

ইন্দ্রনীল সেন
ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া

মাসে দু'টি 'আনন্দমেলা'

'আনন্দমেলা'র জুড়ি মেলা ভার! আনন্দমেলার প্রতি সংখ্যায় কোনও বিষয় নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনি ছাপা কি সম্ভব? আর-একটা কথা, মাসে দু'টি আনন্দমেলা প্রকাশ করলে আমরা খুশি হব। আগামী কোনও সংখ্যায় সুপারম্যানের রঙিন পোস্টার ছাপা হলে ভাল লাগবে। গল্প, কমিক্স, সব ভালই লাগছে। বিশ্বকাপ সংখ্যাও ছিল দারুণ।

সায়ন নন্দী
দশম শ্রেণি, নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়, নদিয়া

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার 'ই-মেল'-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মজাদার বেব্লেড

অগস্ট সংখ্যা 'আনন্দমেলা'র গল্পগুলো এককথায় দুর্দান্ত। সেপ্টেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় পোকেমনের দুনিয়া নিয়ে অনেক অজানা তথ্য ছাপা হয়েছিল। আমার অনুরোধ, মজাদার বেব্লেড নিয়েও এই রকম আলোচনা করা হোক।

রিমিতা দে
অষ্টম শ্রেণি, রানাঘাট ব্রজবালা গার্লস হাই স্কুল
(ই-মেল-এর মাধ্যমে)

সম্পাদকীয় উত্তর: ১৪১৩ সালের 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা'য় বেব্লেড নিয়ে একটি লেখা ছাপা হয়েছে। আশা করি, লেখাটি এত দিনে পড়ে ফেলেছ!

আরও বিজ্ঞানের খবর

আমি নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি। অগস্ট সংখ্যায় 'গুপিচোরের কাণ্ড', 'একশোয় একশো' পড়ে দারুণ লাগল। 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' বিভাগে বিজ্ঞানের আরও খবর চাই।

সৌপম মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় শ্রেণি, এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুল
(ই-মেল-এর মাধ্যমে)

Dabur RED Toothpaste & আনন্দমেলা
anandamela
present
Dental Care Camp
লবঙ্গ, পুদিনা, তোমর
এবার দাঁতের প্রবলেম
চল হট!
নতুন প্যাক
डाबर
लाल दन्त मंजन
स्वस्थ मसूड़े मज़बूत दाँत
Dabur RED Toothpaste
With the goodness of Laung, Pudina and Tomar
Strong teeth. Keeps dental problems away.
তোমার দাঁতের পরীক্ষা
করতে ডাক্তারকাকু
আসছেন তোমার স্কুলে।
জেনে নাও কী করে দাঁত
রাখবে সজীব-সতেজ।
Radio Partner
RED FM 93.5
Bajaate Raho!
লবঙ্গ দাঁতের ব্যথার
বিরুদ্ধে লড়াই করে
তোমর জীবাণু
ধ্বংস করে
পুদিনা দুর্গন্ধ
থেকে বাঁচায়

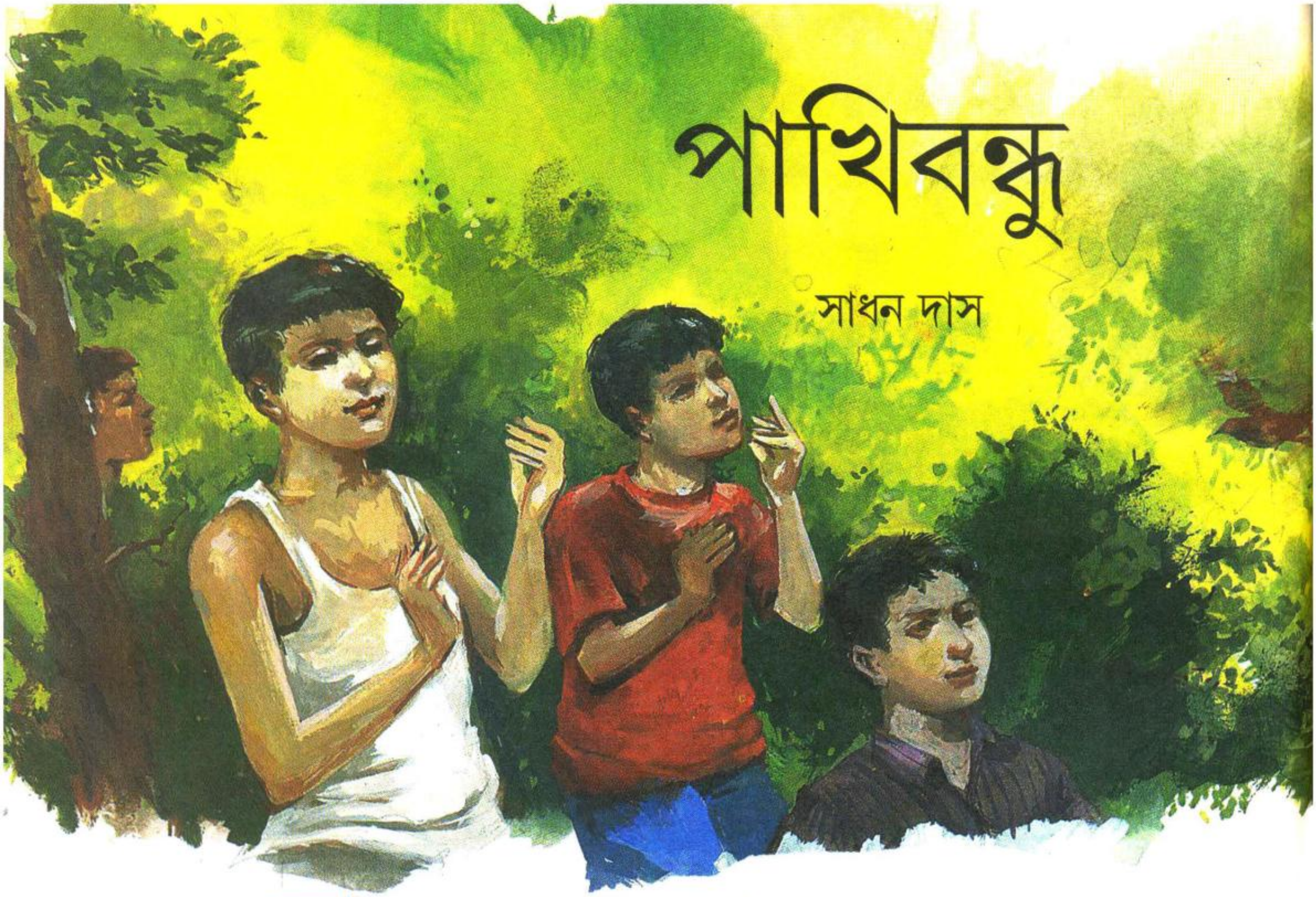

পাখিবন্ধু

সাধন দাস

আজ তাতাইয়ের স্কুল ছুটি। ছুটির দিনগুলোতে তাই তাতাইয়ের চোখে ঘুম নেই। সারা দুপুর সে টোটো করে বেড়াবে। মা'র চোখের পাতা যেই একটুখানি বন্ধ হয়েছে, আর যায় কোথায়! পা টিপেটিপে খিড়কি দরজা খুলে একছুটে বাঁশবনের দিকে। নির্জন দুপুরে বাঁশবনে যে কড়কড় আওয়াজ ওঠে, সেই শব্দটা শুনলেই তাতাই কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। ওর মধ্যে যে ব্যথাটা আছে, তার রহস্য সে উদ্ধার করতে পারে না।

এক জায়গায় মিলে যাওয়ার নির্ঘণ্ট আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। আজও গনগনে দুপুরবেলা তাতাই যেই চুপিচুপি বাঁশবনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ওমনই সেখানে হাজির পাপাই, টুবলু, তোতন। সবাইকে বেশ কষ্ট করে মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে আসতে হয়েছে। প্রতিটি ছুটির দিনেই এই চার মূর্তি দুপুরটা ভরিয়ে তুলবে মজার-মজার খেলায়। কেউ যদি বাড়ির গেটে ধরা পড়ে যায়, তা হলে তাকে ছাড়িয়ে আনতে বাকি তিনজন নানারকম বুদ্ধি খাটিয়ে হাজির হয় তার মায়ের সামনে, "কাকিমা, আজ আমরা ছাতিম গাছের ছায়ায় বসে পড়া-পড়া খেলব, একটুখানি ছেড়ে দাও।"

যাই হোক, আজ কেউ আটকে যায়নি। সকলের মুখেই তাই বিজয়ীর হাসি। যেন সাঁতরে অতলান্তিক পার হয়ে এসেছে। কিন্তু আজকের দুপুরটা কীভাবে কাটানো যায়?

পাপাই বলল, "চল, ঘুড়ি ওড়াই।"

তক্ষুনি টুবলু রে-রে করে উঠল, "এই দুপুরবেলা কেউ ঘুড়ি ওড়ায়?"

তোতন বলল, "চল, পাখি ধরি।"

বাঁশবনে প্রচুর পাখির জটলা এই দুপুরবেলা। কাঠঠোকরা, চড়ুই, হাঁড়িচাচা, বেনেবউ, বসন্তবৌরি, কত যে পাখির বিকেলবেলার বৈঠক বসেছে এখানে! সে এক আলাদা জগৎ। তাতাই কত দিন একা-একা এখানে দাঁড়িয়ে পাখিদের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেছে। ভাবতে-ভাবতে, ভাবতে-ভাবতে আনমনা হয়ে গেছে সে। দূর আকাশের নীলিমা আর পাখিদের কাকলি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কখন।

পাখিদের ঘর-সংসার সম্পর্কে তাতাইয়েরও দারুণ কৌতূহল। তোতনের প্রস্তাবে সে খুশি হল। বলল, "কিন্তু ধরবি কী করে? 'আয়-আয়' বলে আদর করে ডাকলেই তো পাখি এসে ধরা দেবে না!"

টুবলু বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। দাঁড়া, আমি বাড়ি থেকে একটা ঝুড়ি, আর একটা লম্বা দড়ি নিয়ে আসছি। পাপাই, তুই দু'টো বিস্কুট আর একমুঠো মুড়ি নিয়ে আয়।"

দশ মিনিটের মধ্যেই টুবলু বাড়ি থেকে নিয়ে এল একটা ঝুড়ি আর লম্বা একটা দড়ি। পাপাই টিন থেকে মুড়ি নিতে গেলে মা জেনে ফেলবেন বলে, কলতলায় নামানো এঁটো বাসন থেকে কুড়িয়ে একমুঠো ভাত নিয়ে এল।

টুবলু বলল, "বেশ করেছিস, মুড়ির চেয়ে ভাতই ভাল। এই দুপুরবেলা এমনিতেই রসকষ নেই, মুড়ি চিবোতে পাখিগুলোর কষ্ট হবে।" এই বলে টুবলু নিয়ে আসা উপকরণগুলো দিয়ে পাখিদের ফাঁদ তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ঝুড়িটাকে উপুড় করার ভঙ্গিতে একটুখানি তুলে ধরে সেখানে একটা কাঠি আটকে দিল, যাতে পাখিগুলো ভাতের লোভে ঝুড়ির তলায় ঢুকে পড়ে। কাঠিটার তলায় দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে অন্য প্রান্ত নিয়ে দূরে এক ঝোপের আড়ালে বসে রইল চার দস্যি।

কিন্তু আধ ঘণ্টা কেটে গেলেও কোনও নির্বোধ পাখি ভাতের লোভে ঝুড়ির তলায় ঢুকল না।

তোতন বলল, "পাখিগুলো দ্যাখ, কেমন রাতারাতি চালাক হয়ে গেল!"

পাপাই বলল, "বোধ হয় আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা ওরা সব শুনে ফেলেছে। লালঝুঁটি, লেজঝোলা, পেটফোলা, হলদে ঠ্যাং, সবুজ পালক, সব পাখিই কেমন নেচে-নেচে এ-ডাল সে-ডাল করছে, অথচ অত সাধের মাছের ঝোল দিয়ে মাখানো ভাতের দিকে তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই।"

তাতাই বলল, "ওদের দুপুর বোধ হয় এখনও হয়নি। মানুষের মতো তো ওরা হ্যাংলা নয় যে, খাবার দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

বাঁশবনে কড়কড় আওয়াজ ওঠে। তাতাই কেমন বিভোর হয়ে যায়। দূরে নীল আকাশে রোদের মধ্যে ডানা ভাসিয়ে একটা চিল উড়ে চলেছে। হঠাৎ চারজন দেখল, একটা শালিক ঝুড়ির কাছে নেমে এসেছে। কিন্তু ভাতের লোভে ঝুড়ির তলায় ঢুকতে সাহস করছে না। দড়ির এ প্রান্ত টুবলুর আঙুলে জড়ানো। পাখিটা ঢুকলেই টুবলু হ্যাঁচকা টান দেবে। কাঠিটা সরে গেলেই ঝুড়িটা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে, আর ঝুড়িটার ভিতর পাখিটা বন্দি হবে।

শালিকটা নামল। কিন্তু ঝুড়ির তলায় ঢুকছে না কেন? সে কি খাবারগুলো দেখতে পায়নি, নাকি তার এখনও খিদে পায়নি? কে জানে! টুবলু কিছু বলতে যাচ্ছিল, অমনই তোতন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "স্‌স্‌স্‌স্‌...চুপ, পাখিটা ঢুকছে!"

সকলেই প্রায় একসঙ্গে নিশ্বাস বন্ধ করে দেখল, শালিকটা এক পা, এক পা করে ঝুড়ির তলায় ভাতের দিকে এগোচ্ছে। যেই না পাখিটা ঝুড়ির বৃত্তের সীমার মধ্যে ঢুকে টুপটাপ করে ভাতগুলো খেতে শুরু করেছে, অমনই টুবলু দড়িতে হ্যাঁচকা টান দিল। আর যায় কোথায়! মুহূর্তের মধ্যে ঝুড়িটা উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। আর শালিকটা ধরা পড়ে গেল ঝুড়িটার নীচে।

ঝুড়ির নীচে পাখিটা বাঁধা পড়তেই চারজন এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল, যেন সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল ধরে ফেলেছে তারা। ঝুড়ির নীচে পাখিটা ফরফর করে ডানা ঝাপটাচ্ছে। টুবলু ওদের মধ্যে বেশি সাহসী। সে পাখিটাকে ধরার জন্য ঝুড়িটা একটু তুলল।

তোতন বলল, "দেখিস, আবার পালিয়ে না যায়!"

না, পাখিটা পালাতে পারল না। টুবলু সন্তর্পণে হাত ঢুকিয়ে পাখিটাকে খপ করে ধরে ফেলল। পাখিটার মোলায়েম লোমগুলোয় সকলেই একবার করে হাত বোলাল। বেশি উৎসাহ তোতনের। সে পাখিটার খাবার জন্য দুব্বোঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে এল একগোছা। পরম কৌতূহলে সেগুলো পাখিটার হলদে দু'ই ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিল। কিছুক্ষণ নরম ডগাগুলো চিবিয়ে পাখিটা তা উগরে দিল।

পাপাই বলল, "পাখিটা বোধ হয় নিরামিষ খেতে পছন্দ করে না।"

এইভাবে অনেক সময় ধরে পাখিটাকে নিয়ে চারজন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল। শেষে পাখিটার একটা পায়ে দড়ি বেঁধে একটা ছোট গাছের গোড়ায় বেঁধে রাখল। পাখিটা কী করে দেখার জন্য তারা দূরে বসে রইল।

তারা দেখল, আধ ঘণ্টা পর একদল শালিক পাখি তার কাছে বসে কিচিরমিচির করতে শুরু করল। কেউ বন্দি পাখিটার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে আদর করল, কেউ ঠোঁট দিয়ে তার দড়িটা কাটার চেষ্টা করল, কেউ বা দূর থেকে শুধু মৌখিক সমবেদনা জানাল।

তাতাই বলল, "দ্যাখ টুবলু, মানুষের মধ্যেও এত মায়া আর বন্ধুত্ব দেখা যায় না।"

এক সময় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বাড়ি ছেড়ে অনেকক্ষণ তারা বেরিয়েছে। এবার বাড়ি ফেরার পালা। বাড়িতে সকলেরই মা দুপুরের ঘুম থেকে এখনই জেগে উঠবেন। তার আগেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়াটা নিরাপদ। কিন্তু পাখিটার কী হবে? এত কষ্ট করে বুদ্ধি খাটিয়ে ধরা পাখিটাকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না! আবার এখানে রেখে গেলেও কুকুর-বেড়ালে খেয়ে ফেলবে।

পাপাই বলল, "তাতাই, তুই বরং পাখিটা নিয়ে গিয়ে রাখ। তোদের চিলেকোঠায় একটা ভাঙা খাঁচা আছে, সেটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিস ওটাকে। কাল সকালে কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

তাতাইয়ের উপর পাখিটার জীবন-মরণ সমর্পণ করে বন্ধুরা যে যার বাড়ি চলে গেল।

তাতাই ভাবতে লাগল পাখিটাকে নিয়ে এখন সে কী করবে! বাড়ি নিয়ে গেলে তো মা লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন। তা ছাড়া পাখিটা যদি মরে যায়, তা হলে দোষের ভাগী হতে হবে তাকেই। তাতাই ভাবল, পাখিটাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। মিথ্যে করে সে বন্ধুদের বলবে, পাখিটা কখন ঠোঁট দিয়ে দড়ি কেটে উড়ে পালিয়ে গেছে। সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, পাখিটাকে ছেড়েই দেবে।

১০টি কিশোর উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী
১৭৫.০০

• রাজকুমারের পোশাকে • গজ উকিলের হত্যা-রহস্য • ভুতুড়ে কুকুর • লঙ্কা মরিচ ও এক মহাদানব • মানুষের মতো মানুষ • চারা পুঁতে গেলেন নান্টুপিসে • বোমার চেয়ে বিষম • সমুদ্দুর দেখা • অলয় আদিত্যর ইচ্ছাপত্র রহস্য • হারানো থেকে প্রাপ্তি

বিমল কর
২০০.০০

হাসির উপন্যাস • ওয়ান্ডার মামা • গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানি
অলৌকিক কাহিনী • অলৌকিক • সিসের আংটি
কল্পবিজ্ঞান কাহিনী • হারানো জীপের রহস্য • কিশোর ফিরে এসেছিল • মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না
গোয়েন্দা-রহস্য কাহিনী • হারানো ডায়েরির খোঁজে • কালবৈশাখীর রাত্রে
ডাকাত-কাহিনী • রাবণের মুখোশ

মতি নন্দী
২২৫.০০

• ননীদা নট আউট • স্ট্রাইকার • স্টপার • অপরাজিত আনন্দ • নারান • ফেরারি • দলবদলের আগে • শিবার ফিরে আসা • তুলসী • মিনুচিনুর ট্রফি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
২০০.০০

• গৌরের কবচ • হারানো কাকাতুয়া • গোলমাল • চক্রপুরের চক্করে • ছায়াময় • সোনার মেডেল • পাতালঘর • হরিপুরের হরেক কাণ্ড • দুধসায়রের দ্বীপ • বিপিনবাবুর বিপদ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
২০০.০০

• সত্যি রাজপুত্র • হলদে বাড়ির রহস্য • দিনে ডাকাতি • ডুংগা • জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ • আঁধার রাতের অতিথি • আকাশ দস্যু • কালো পর্দার ওদিকে • উদাসী রাজকুমার • অন্ধকারের বন্ধু

প্রিয়জনকে

আনন্দ উপহার

গিফট কুপন

১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা, ৫০০ টাকা, ও ১০০০ টাকা মূল্যের এই কুপনের বিনিময়ে পাবেন পছন্দের বই। কুপন কেনার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বই সংগ্রহ করতে হবে। গিফট কুপন পাওয়া যাবে ৬৭এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, কলকাতা-৭০০০৯ এবং ১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯-এ অবস্থিত আমাদের বিপণন কেন্দ্র থেকে।

দক্ষিণ কলকাতায় আনন্দ-র বই

১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯,
ফোন: ২৪৬৪-৬২১২

এখানে পাবেন আনন্দ-প্রকাশিত সমস্ত বই।
নিজের হাতে দেখে পছন্দ করে বই কেনার সুযোগ।
রবিবারেও খোলা থাকছে।

আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

হঠাৎ একটা মজার বুদ্ধি মাথায় এল। তাতাই পত্রমিতালি করতে ভালবাসে। পত্রিকা থেকে বন্ধুদের নাম-ঠিকানা নিয়ে সে কিছু নতুন পত্রবন্ধু করেছে। পাখিটাকে চিলেকোঠার ভাঙা খাঁচায় বেঁধে রেখে তাতাই নীচে এসে একটা সাদা কাগজে সুন্দর করে লিখল, 'এই পাখি যে ধরবে, সে আমার বন্ধু হবে।' তারপর সে তার নাম-ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখল। কিন্তু বৃষ্টি হলে তো কাগজটা ভিজে ছিঁড়ে যাবে! তাই দিদির বাক্স থেকে সেলোটেপ এনে কাগজটার গায়ে ভাল করে সেঁটে দিল তাতাই, যাতে লেখাগুলোর উপর বৃষ্টির ছাঁট না লাগে। তারপর দিদির বাক্স থেকে সুতো এনে, ঠিকানা লেখা সেলোটেপ-বসানো কাগজটা ফুটো করে সুতো দিয়ে বেঁধে, সুতোর আর-এক দিক পাখিটার একটা পায়ে বেঁধে দিল তাতাই। মনে-মনে সে রূপকথার গল্পের মতো অনেক কিছু কল্পনা করল। পাখিটা উড়তে-উড়তে এক দিন সাত সমুদ্র পেরিয়ে অজানা দেশে পৌঁছে যাবে। তারপর সেখানে একজন না-একজনের হাতে পাখিটা ধরা পড়বে। ধরা পড়লেই সে তার হাতের লেখা কাগজটা পড়ে তাকে চিঠি লিখবে। স্বপ্নে পাওয়া রাজকন্যের মতো পক্ষীরাজ বন্ধু! অনেক অসম্ভব কল্পনা করতে-করতে ছাদের কোণে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাতাই পাখিটাকে উড়িয়ে দিল। প্রায় হাতখানেক লম্বা একটা সুতোর ডগায় ঠিকানা লেখা কাগজটা ঝুলিয়ে নিয়ে পাখিটা প্রাণপণে উড়ে চলল শিমুল গাছটার উপর দিয়ে, কচুরিপানায় ভরা দিঘিটার পাশ দিয়ে, রিঙ্কিদের দোতলা বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে আরও দূর আকাশের দিকে। এক সময় পাখিটাকে আর দেখা গেল না।

পরদিন তাতাই বন্ধুদের বানিয়ে-বানিয়ে বলে দিল যে, পাখিটা নিজেই বাঁধন কেটে কখন পালিয়ে গেছে, সে জানেই না। কিন্তু মনে-মনে সে অপেক্ষায় থাকল, কখন তার নামে এক অজানা বন্ধুর চিঠি আসবে। সে বন্ধু অনেক দূরের কোনও গ্রামের অথবা তার জানা কোনও গ্রামেরই নয়, অন্য কোনও আকাশের তলায়, অন্য কোনও নতুন জনপদের। রোজ সে পিয়নের অপেক্ষায় থাকে।

অনেক দিন ধরে কোনও চিঠি তার নামে না আসায় তাতাই সাত-পাঁচ নানারকম ভাবতে থাকল। ভাবল, পাখিটা বোধ হয় পথ হারিয়ে কোনও গভীর বনের মধ্যে চলে গেছে, যেখানে কোনও জনপ্রাণী নেই। অথবা অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে একঝাঁক শঙ্খচিলের সঙ্গে সে বোধ হয় আজও উড়ে চলেছে। কারও উঠোনে চাল খুঁটে খাবার জন্য সে বোধ হয় আজও নামেনি। হয়তো তার আইডেনটিটি স্লিপ কোনও গ্রামের রাখালের হাতে পড়েছে। সেই রাখাল তো পড়তেই পারে না, তাকে চিঠি লিখবে কেমন করে! এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে একদিন ভুলেই গেল তাতাই সেই পাখিটার কথা।

সামনে বার্ষিক পরীক্ষা। রাত জেগে পড়া মুখস্থ করা আর তিন-চারজন টিউটরের কাছে পড়তে যাওয়া, এই সবের মধ্যে পাখির বৃত্তান্ত আর মনেই নেই।

একদিন তাতাই সকালবেলা পড়তে বসেছে। এমন সময় পিয়ন সাইকেলের ঘণ্টি বাজাল। তাতাই দরজা খুলে তার কাছে যেতেই পিয়নকাকু বলল, "তোমার চিঠি আছে বাবা!" এই বলে পিয়নকাকু তার হাতে একটা সুদৃশ্য খাম দিল। খামের গায়ে সবুজ গাছপালা আর একটা সুন্দর পাখির ছবি আঁকা। তাতাই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। খামের ভিতর কোন বিস্ময় লুকিয়ে আছে কে জানে! হাত কাঁপছে তাতাইয়ের। একটা ফুলভরা রঙ্গন গাছের তলায় বসে সে খামটা খুলল। খুলতেই সে চমকে উঠল। ভিতরে ক্যামেরায় তোলা একটি পোস্টকার্ড সাইজ ফোটোগ্রাফ। সেই ফোটোয় দেখা যাচ্ছে, একটি উঁচু গাছের ডালে সুতোয় বেড়ি লেগে একটি শালিক পাখি মরে গিয়ে ঝুলে আছে! তাতাইয়ের বুকটা ধড়াস করে উঠল। ওই তো তারই শালিক পাখিটাই তো! খামের মধ্যে ফোটোগ্রাফের সঙ্গে সবুজ কাগজে লেখা একটি চিঠি। তাতে লেখা 'একটি নিরীহ পাখির জীবনের মূল্যে তোমাকে পেলাম। তুমি আমার পাখিবন্ধু। কিন্তু এমনটি আর কখনও কোরো না বন্ধু!' তার পর সেই নতুন বন্ধুর নাম-ঠিকানা লেখা। বিহ্বল, স্তম্ভিত তাতাইয়ের হাত থেকে হঠাৎ খামটা মাটিতে পড়ে গেল।

তাতাই আর কোনও দিন বাঁশবনের দিকে যায়নি।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

পুজোয় বেড়ানো নিয়ে কবিতা:
'ছোটমাসি থাকে নেপচুনে আর/
মেজোমামা মঙ্গলে/
এবার পুজোয় স্পেসশিপে চড়ে/
সেইখানে যাব চলে।'
প্রতিযোগিতার ফলাফল।

পাঠকের পাতা

এবারের প্রতিযোগিতা

এই মাস দীপাবলির। আলো আর আতশবাজিতে মেতে উঠবে তোমরা। তাই এবার এঁকে পাঠাও 'আতশবাজির দীপাবলি'। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু ছবিটি এঁকে পাঠাবে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে ছবিটি প্রত্যয়িত করিয়ে দিও। সেরা কয়েকটি ছবি আমরা অক্টোবর সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা: **পাঠকের পাতা**
আনন্দমেলা ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

ছবি: সায়ন্তনী চন্দ্র

১

নেপচুনটা যে বেশি দূরে তাই
সেইখানে যাব আগে,
গত মাসে কেনা স্পেসশিপটায়
ঘণ্টা এগারো লাগে।
মহাষ্টমীতে মাসিদের নিয়ে
উড়ব মামার বাড়ি,
নবমী-দশমী মঙ্গলে থেকে
পৃথিবীতে দেব পাড়ি।

সোহম সামন্ত
চতুর্থ শ্রেণি
কলকাতা পাবলিক স্কুল
জোড়ামন্দির
কলকাতা

২

ঠাকুর দেখব অষ্টমীতে
বৃহস্পতির জঙ্গলে
এলিয়েনদের প্যান্ডেলগুলো
দেখব যে বুঝে প্রাণ খুলে!
স্পেসশিপটার মুখটা ঘোরাব
গোটা ছুটি শেষ হলে,
আলোর বেগেই শাঁই শাঁই ছুটে
নামব বে-অব বেঙ্গলে।

জিগীষা ভট্টাচার্য
সপ্তম শ্রেণি
রামকৃষ্ণ শিশুতীর্থ হাই স্কুল
ডানকুনি, হুগলি

৩

যেতে-যেতে পথে বেস্পতি আর
শনিটাও নেব দেখে,
মামা-মাসি নিয়ে সূর্যের দেশে
শরতের আলো মেখে।
ফিরে এলে দেশে, নাসা থেকে এসে
সমাদর পাব সে কী!
মা ডেকে বলেন, "ওঠ এইবারে,
বকছিস যা-তা এ কী?"

সুকন্যা গোস্বামী
অষ্টম শ্রেণি
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল
কলকাতা

৩

চার দেওয়ালের বন্দি জীবন
ভাল লাগে না তো আর
মেলব ডানা উড়ব ক'দিন
উধাও সাগর পার।
বড়মামা সঙ্গে আছেন
ভয়টা আমার কীসে
চাঁদের দেশে ঘুম ভাঙবে
হরেক পাখির শিসে।

সুচয়ন বিশ্বাস
চতুর্থ শ্রেণি
পাঠভবন
মুর্শিদাবাদ, নদিয়া

এ ছাড়া যাদের কবিতা ভাল লেগেছে

সঙ্গে নিয়েছি টেলিস্কোপ আর
একখানা স্পেসসুট
মাসি বলেছেন, নেপচুনে যেতে
চাই ভাল হিলবুট।
তার আগে যাব নাসার অফিসে
করব রিজার্ভেশন
বেশি দেরি হলে হাতছাড়া হবে
ফুরিয়ে যাবে সেশন।

অয়ন ওঝা
অষ্টম শ্রেণি, পাঠভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বাবা-মা আর দিদিকে নিয়ে
যাব আমি খুব দূরে,
নতুন জামায়, নতুন জুতোয়
নেপচুনটাও আসব ঘুরে।
রেড প্ল্যানেট মার্স এবং
ক্লোড প্ল্যানেট প্লুটোও,
এবার পুজোয় সক্কলে মিলে
ঘুরব এই দু'টোও।

শ্রেয়া শেঠ
পঞ্চম শ্রেণি, নব নালন্দা হাই স্কুল, কলকাতা

পৃথিবীর থেকে পাড়ি দেব মোরা
ষষ্ঠী-বোধন হলে,
সপ্তমীরাতে সন্ধ্যাতারাকে
হাত নেড়ে যাব চলে।
মঙ্গল থেকে মামাদের নিয়ে
শনিতে মহাষ্টমী,
মাসির আদরে নেপচুনে ভেসে
শেষ হয়ে যাবে দশমী।

মোহিনী ঘোষ
পঞ্চম শ্রেণি, হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুল

হার মানেনি জগন্নাথ

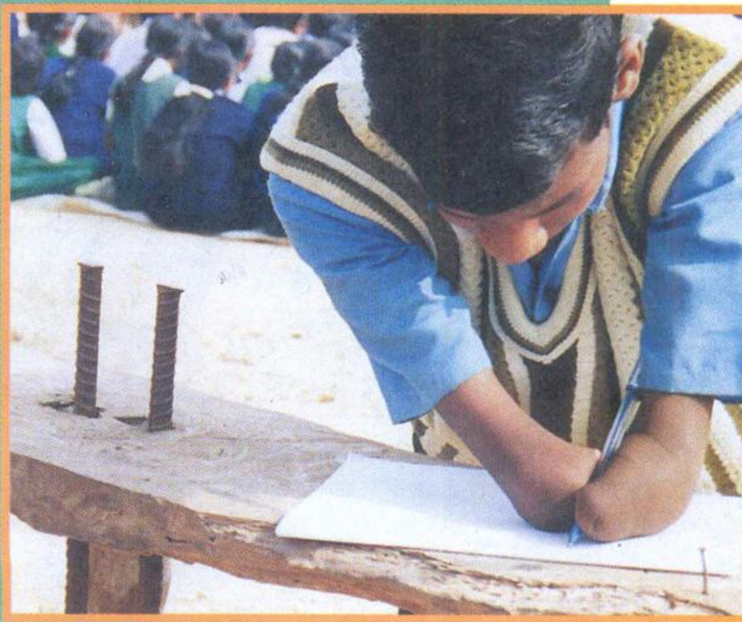

কনুইয়ের কাছ থেকে দু'টি হাতই নেই জগন্নাথ মাহাতোর। তবু তিলাসন হাই স্কুলের ক্লাস টেনের এই ছাত্রটি সকলের কাছে আজ দৃষ্টান্ত। লিখেছেন সুখেন্দু দাশ

জগন্নাথ বেশ সুস্থ সবল, আর পাঁচজন কিশোরের মতোই। সব কাজই করতে পারে। সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, কোদাল কুপিয়ে মাটি কাটা, মাঠের কাজ, সব কিছু। শুধু কি তাই, পড়াশোনা, তাড়াতাড়ি লেখা, ছবি আঁকা, সভায় বক্তৃতা করা, সব কিছুতেই অন্যদের মতোই ও স্বাভাবিক। এর মধ্যে অস্বাভাবিক হল, ওর দু'টি হাতই নেই।

কনুইয়ের কাছ থেকে দু'টি হাতই নেই জগন্নাথ মাহাতোর। জন্ম থেকেই। ছ' ভাইবোনের সংসারে একমাত্র ও-ই প্রতিবন্ধী হয়েই জন্মেছে।

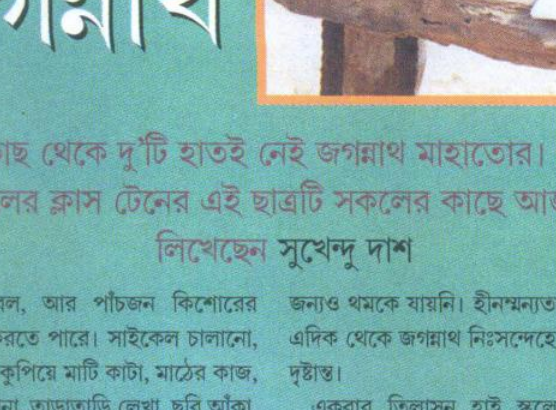

কিন্তু হার না মানার মানসিক শক্তি বছর ষোলোর জগন্নাথকে এক অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছে। শারীরিক ঘাটতি ওকে কণামাত্র দুর্বল করতে পারেনি। ও সমান তালে লড়াই চালিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পে অবিচল।

দু'টি প্রতিবন্ধী হাতেই ও ষোলো-সতেরো কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়ে বুলবুলচণ্ডী চলে যায়। পলাশবোনার বাড়ি থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়ে প্রতিদিন পড়তে আসে তিলাসন হাই স্কুলে। পুকুরে সাঁতার কাটে, মাঠে চাষের কাজ করে, নিজেই ভাত খায়। কারও কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য ও নেয় না। অদ্ভুত মনের জোরে জগন্নাথ সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে জয় করেছে। মুহূর্তের জন্যও থমকে যায়নি। হীনম্মন্যতা ওর কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়। এদিক থেকে জগন্নাথ নিঃসন্দেহে অন্যদের কাছে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

একবার তিলাসন হাই স্কুলে বসেছিল ভারত সরকারের উদ্যোগে বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আসর। জগন্নাথ সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। ওই দু'টি প্রতিবন্ধী হাত দিয়েই ছবি এঁকে সে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সকলকে। সেদিন সাইকেলও চালাল, এমনকী ক্রিকেটও খেলল দু' হাতে ব্যাট ধরে।

জগন্নাথ এখন ক্লাস টেনের ছাত্র। ভাইবোনের মধ্যে ও মেজো। বড়দাদা চাষের কাজ করেন। বাবা নরেন্দ্রনাথ মাহাতো অসুস্থ। কৃষিজীবী। বিঘে দু'ই মাত্র জমি। অভাব-অনটনেই সংসার চালান। স্কুলের শিক্ষকরা সাহায্য করেন জগন্নাথকে। করবেন না-ই বা কেন! ক্লাস ফাইভ থেকেই তো জগন্নাথ তিলাসন হাই স্কুলে পড়ছে। সকলের মায়া পড়ে গিয়েছে।

মালদা জেলার হাবিবপুর ব্লকের তিলাসন হাই স্কুলে সাতশো ছাত্রছাত্রীর মধ্যে জগন্নাথ নজর কেড়েছে।

পিছিয়ে পড়া এলাকায় থেকে, পিছিয়ে পড়া পরিবারে জন্মেও ওর জয় করবার মানসিকতা অন্যদের চেয়ে ওকে কয়েক যোজন এগিয়ে দিয়েছে।

ফোটো: শাম্বাদিত্য দাশ

ইলেকট্রিক স্কুটার 'সেগওয়ে'

দেখতে সুন্দর, ছিমছাম গড়ন, পেট্রোল লাগে না, রাস্তা দিয়ে চলার সময় বেশি জায়গাও নেয় না, আর তার সব সময়ের সঙ্গী ইলেকট্রিক চাবি আর অ্যালার্ম সিস্টেম! এই বায়োডেটা যার, তার নাম 'সেগওয়ে স্কুটার' (ডান দিকের ছবি)। এ-বছর অগস্ট মাসে মার্কিন প্রযুক্তিবিদরা বাজারে আনলেন এই স্কুটার। একজনের বেশি বসার জায়গা নেই এই যানে। পরিবেশ দূষণ করবে না সেগওয়ে। কারণ, পেট্রোল নয়, ইলেকট্রিক চার্জে চলবে এই স্কুটার। দিক পরিবর্তন করার জন্য হ্যান্ডেলবার ব্যবহার করার কোনও দরকার নেই। গাড়ি চালাতে-চালাতে ডান বা বাঁ দিক, যেদিকে ঝুঁকবেন চালক, স্কুটারের মুখ ঘুরে যাবে সেদিকেই।

বিজ্ঞানীরা তৈরি করছেন হ্যারি পটারের অদৃশ্য জামা

শুধু বিশেষ ধরনের একটা জামা পরার অপেক্ষা, ব্যস, তারপরই অদৃশ্য। আশপাশের লোকজনের সামনে থেকে বেমালুম উধাও একেবারে। হলিউডের কোনও সায়েন্স ফিকশনের কাহিনি মনে হচ্ছে? নাকি মনে হচ্ছে এ সেই হ্যারি পটারের অদৃশ্য জামার গল্প। কিন্তু না, এবার আর কল্পনার আকাশে পক্ষীরাজ ঘোড়া নয়, বিজ্ঞানীরা সত্যিই তৈরি করতে চলেছেন 'ইনভিজিবিলিটি ক্লোক'। এত দিন যা ছিল ম্যাজিকের মায়াজাল, বিজ্ঞানীরা তাকে আজ রূপ দিতে চলেছেন বাস্তবে। ব্রিটেনের 'ন্যাশনাল আকাডেমি অফ সায়েন্স'-এর বিজ্ঞানীরা বলছেন, এরকম অদৃশ্য জামা তৈরি করা সত্যিই সম্ভব। লন্ডনের 'ইম্পিরিয়াল কলেজ'-এর প্রোফেসর ক্রিস ফিলিপস-এর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, কীভাবে অদৃশ্য করে দেওয়া যায় কোনও জিনিস। তিনি আর তাঁর সহকর্মী ডঃ মার্ক ফ্রোগলি বিশেষ ধরনের একটা জিনিসের এক বর্গ মিলিমিটারের এক ভগ্নাংশকে এক সেকেন্ডের কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্য অদৃশ্য করে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীরা এই অদৃশ্য জামা তৈরির নকশা নিয়ে গবেষণাপত্রও প্রকাশ করেছেন। এরকম জামা তৈরি করতে লাগবে বিশেষ ধরনের একটি পদার্থ, নাম 'মেটামেটিরিয়াল'। এই পদার্থ দিয়ে তৈরি কোনও জিনিসের উপর আলো পড়লে কোনও প্রতিফলন হবে না। মার্কিন ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের দাবি, মহাকাশ অভিযান, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগবে এই অদৃশ্য জামা। তবে অনেকে বলছেন যে, এই জামা তৈরি বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ, এর আগেও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এবং ফিজিক্স-এর অধ্যাপক সুসুমা তাচি অদৃশ্য জামা তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি সফল হননি।

নাবাজ়টাগ-এর কেরামতি

মাসখানেক আগের কথা। ফ্রান্সের একটি কোম্পানি 'ভায়োলেট'-এর চেয়ারম্যান প্যারিসে দেখাচ্ছিলেন 'নাবাজ়টাগ'কে। নাবাজ়টাগ প্লাস্টিকের তৈরি একটি ছোট্ট রোবট (সঙ্গের ছবি)। অনেক কিছু করতে পারে এই রোবটটি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে নাবাজ়টাগের টিভির অ্যান্টেনার মতো দু'টো কান। এই কান দু'টোর সাহায্যে ই-মেল আর মোবাইল ফোনের মেসেজ পড়ে ফেলে নাবাজ়টাগ। আরও আছে, বাড়ির আদরের শিশুটি জেগে বসে আছে? ঠিক সময়ে তাকে শুতে যেতে বলবে নাবাজ়টাগ। স্টক এক্সচেঞ্জ ধসে পড়েছে? ইন্টারনেটের সাহায্যে জানিয়ে দেবে তা-ও।

রিভলভার থেকে গুলি ছুড়তে লাগবে পাসওয়ার্ড

কম্পিউটারের মতো এবার রিভলভারের গুলিতেও থাকবে পাসওয়ার্ড। রিভলভার থেকে এই গুলি চালাতে হলে সঠিক পাসওয়ার্ড দিয়ে গুলির ভিতরে থাকা একটি সুইচকে সক্রিয় করতে হবে। যিনি এই গুলি কিনবেন, তাঁর রিভলভারের সঙ্গে মিল থাকতে হবে এই পাসওয়ার্ড-এর। গুলি চালানোর আগে সঠিক পাসওয়ার্ড দিতে হবে ওই আগ্নেয়াস্ত্রের মালিককে। আর তাই, এর মালিক ছাড়া অন্য কেউ চালাতে পারবে না এই আগ্নেয়াস্ত্র।

গন্ধ ধরার যন্ত্র

টেপ রেকর্ডারে গানবাজনা রেকর্ড করার মতো এরকম কোনও যন্ত্র যদি হাতের কাছে পাওয়া যেত, যাতে রেকর্ড করা যাবে নিজের পছন্দসই মনমাতানো সব খাবারের গন্ধ, কেমন হত তা হলে? শুনে মনে হতে পারে, এ শুধু সম্ভব কল্পবিজ্ঞানের গল্পেই, বাস্তবে নয়! কিন্তু জাপানের 'টোকিও ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'র বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাঁরা তৈরি করে ফেলেছেন এরকমই একটা যন্ত্র! এই যন্ত্রে নাকি গন্ধ ধরে রাখা যাবে! আর যখন দরকার হবে, ঠিক টেপ রেকর্ডারের মতোই 'প্লে ব্যাক' করে পছন্দসই জিনিসের সৌরভে সুবাসিত করে নেওয়া যাবে মনপ্রাণ। গন্ধ ধরে রাখার জন্য যন্ত্রের মুখটাকে শুধু ঘুরিয়ে রাখতে হবে গন্ধের উৎসের দিকে। গবেষকরা বলছেন, কোন খাবারের কী গন্ধ, এই যন্ত্রের সাহায্যে ভোজনরসিকরা রেস্তরাঁয় খেতে বসার আগেই জেনে নিতে পারবেন তাও।

জয় সেনগুপ্ত

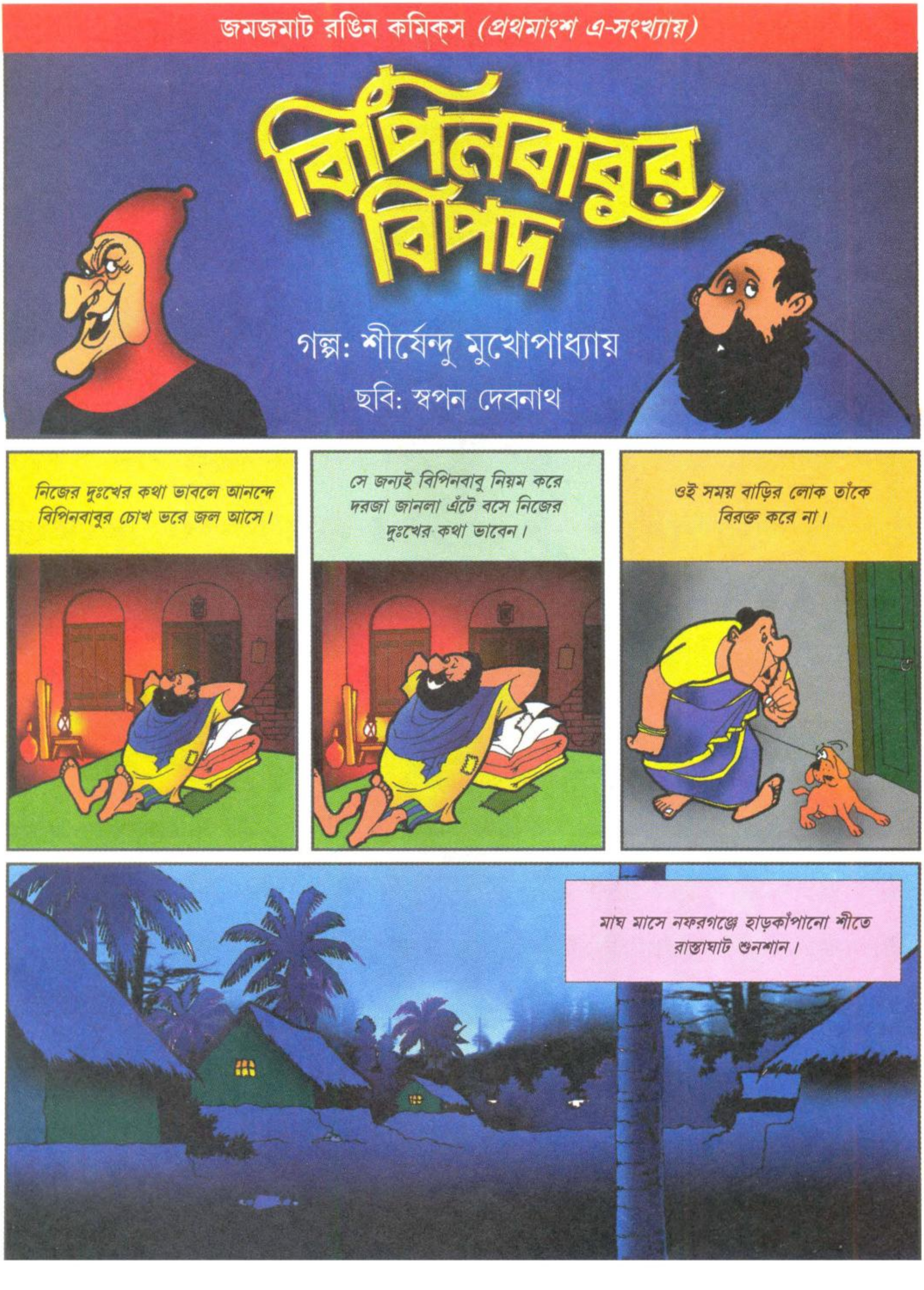
জমজমাট রঙিন কমিক্স (প্রথমাংশ এ-সংখ্যায়)
বিপিনবাবুর বিপদ
গল্প: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ছবি: স্বপন দেবনাথ
নিজের দুঃখের কথা ভাবলে আনন্দে বিপিনবাবুর চোখ ভরে জল আসে।
সে জন্যই বিপিনবাবু নিয়ম করে দরজা জানলা এঁটে বসে নিজের দুঃখের কথা ভাবেন।
ওই সময় বাড়ির লোক তাঁকে বিরক্ত করে না।
মাঘ মাসে নফরগঞ্জে হাড়কাঁপানো শীতে রাস্তাঘাট শুনশান।

বিপিনবাবু নিজের ঘরে বসে দুঃখবিলাস করছেন।
বিপিনবাবু আছেন নাকি? ও বিপিনবাবু...
কে ডাকছে?
আজ্ঞে, এই যে আমি!
কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?
বলছি মশাই, এই শীতে একটু ঘরে ঢুকতে দেবেন তো?
বাইরের লোক এলে লৌকিকতার ভয়ে বিপিনবাবু দরজা আটকে দাঁড়ান।
সংক্ষেপে যা বলার বলুন।
বিপিনবাবুকে গুঁতো মেরে ঘরে ঢুকে পড়ে লোকটা।

এই শীতে বুড়ো মানুষটাকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছিলেন না? লোকে আপনাকে পাষণ্ড বলে, ঠিকই করে।
পাষণ্ড আমি, না আপনি? কনুই দিয়ে ওরকম গুঁতো দিলেন...
না হলে কি তোমার মতো হাড়কেপ্পন আমায় ঢুকতে দিত? খরচের ভয়ে সংসারী অবধি হওনি।
বেশ করেছি, নিজের পয়সায় হাড়কেপ্পন হয়েছি।
তা ঠিক, আসলে একজন পাকাপোক্ত কেপ্পনই আমার দরকার।
শুনুন, আমি একটু হিসেবি, কৃপণ নই। মর্তমান কলা খাই রোজ, বাজার থেকে ভাল-ভাল জিনিস কিনি।
খাও তো, নিজের গাছের মজা কলা, দোকানির ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে আনো।
যাক্‌গে, কৃপণ বলে নিজেকে স্বীকার করলে মেলা টাকাপয়সা এসে যেত হাতে।

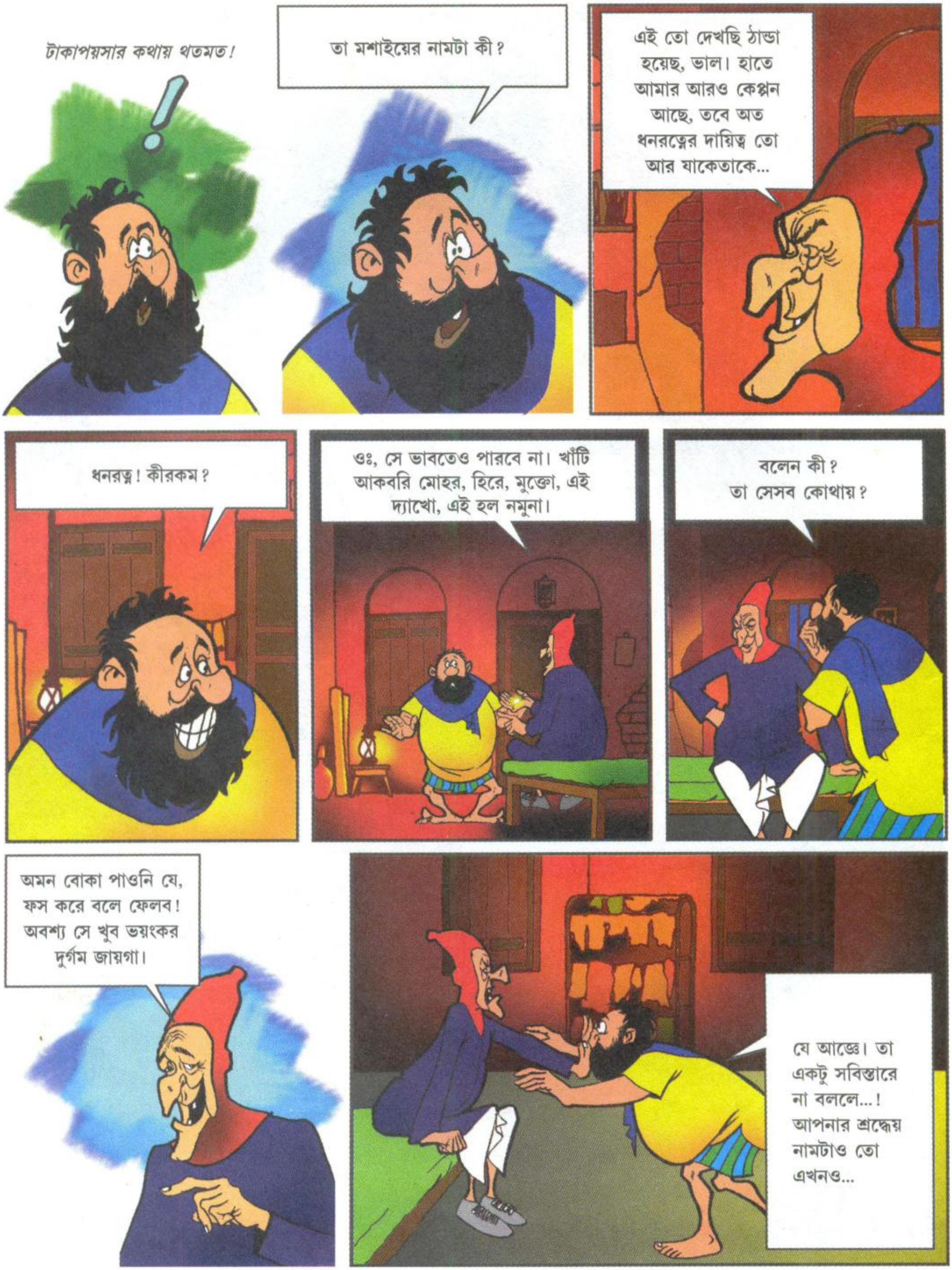

টাকাপয়সার কথায় থতমত!
তা মশাইয়ের নামটা কী?
এই তো দেখছি ঠান্ডা হয়েছ, ভাল। হাতে আমার আরও কেপ্পন আছে, তবে অত ধনরত্নের দায়িত্ব তো আর যাকেতাকে...
ধনরত্ন! কীরকম?
ওঃ, সে ভাবতেও পারবে না। খাঁটি আকবরি মোহর, হিরে, মুক্তো, এই দ্যাখো, এই হল নমুনা।
বলেন কী? তা সেসব কোথায়?
অমন বোকা পাওনি যে, ফস করে বলে ফেলব! অবশ্য সে খুব ভয়ংকর দুর্গম জায়গা।
যে আজ্ঞে। তা একটু সবিস্তারে না বললে...! আপনার শ্রদ্ধেয় নামটাও তো এখনও...

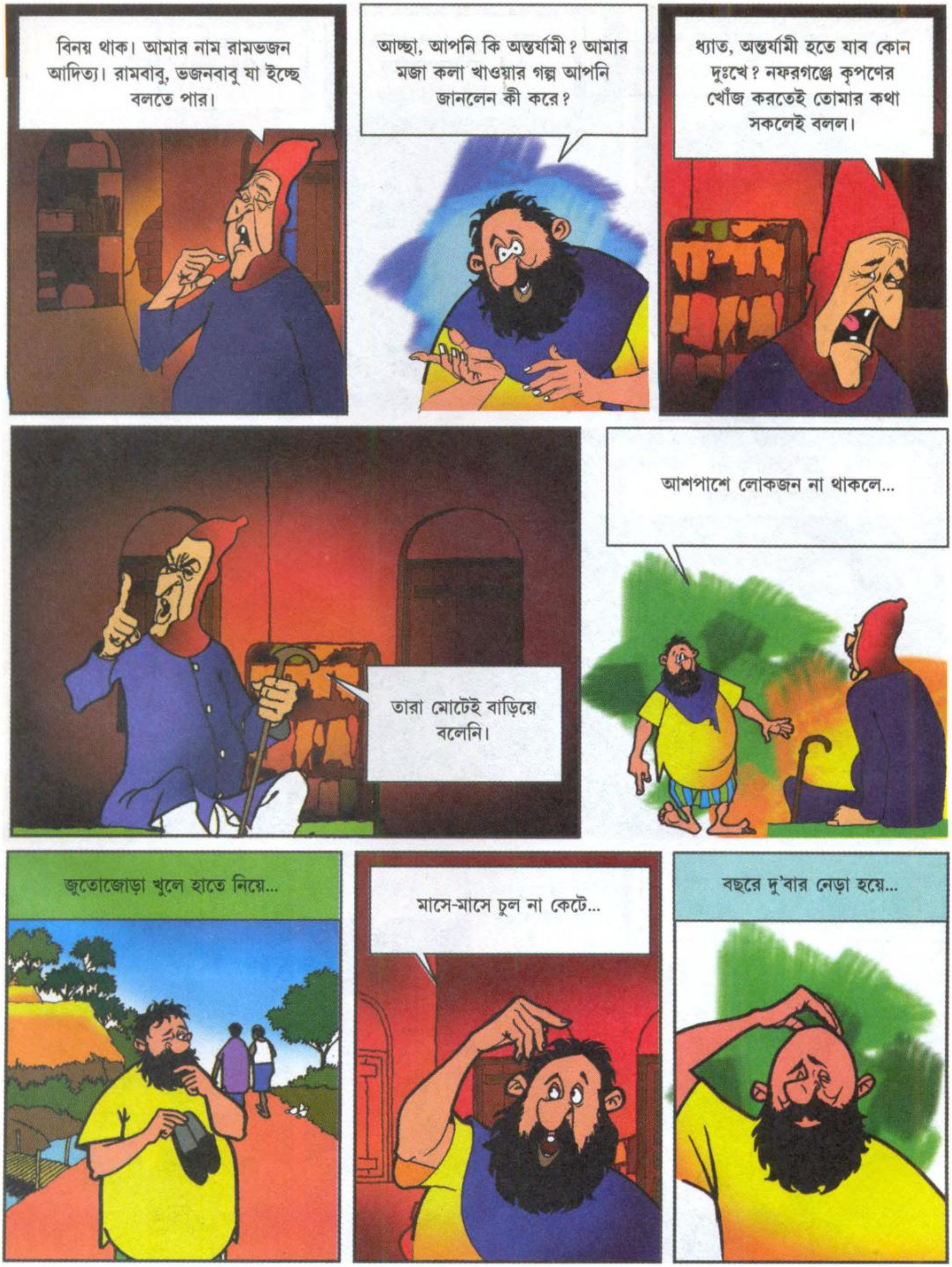

বিনয় থাক। আমার নাম রামভজন আদিত্য। রামবাবু, ভজনবাবু যা ইচ্ছে বলতে পার।
আচ্ছা, আপনি কি অন্তর্যামী? আমার মজা কলা খাওয়ার গল্প আপনি জানলেন কী করে?
ধ্যাত, অন্তর্যামী হতে যাব কোন দুঃখে? নফরগঞ্জে কৃপণের খোঁজ করতেই তোমার কথা সকলেই বলল।
তারা মোটেই বাড়িয়ে বলেনি।
আশপাশে লোকজন না থাকলে...
জুতোজোড়া খুলে হাতে নিয়ে...
মাসে-মাসে চুল না কেটে...
বছরে দু'বার নেড়া হয়ে...

দাড়ি কামানোর খরচ বাঁচাতে দাড়ি রেখেছি।
সবই বুঝলুম, তবে আরও একটু বাজিয়ে দেখতে হবে বাপু।
আজ্ঞে, আপনার জহুরির চোখ!
তা ঠিক, তুমি কেপ্পনই বটে! এই শীতেও এককাপ চা খাওয়ালে না।
চা, ওরে বাবা! সে তো অনেক জিনিসের বায়নাক্কা।
আরে, সাতরাজার ধন মানিক পেতে যাচ্ছ, খরচ না হয় একটু হলই।
তবে কি আমাকে পছন্দ হয়েছে?
মন্দ কী?
চায়ের কথাটা বলি? সঙ্গে দু'টো বিস্কুট?

বিস্কুট ?
মূর্ছা যাওয়ার কিছুই নেই! চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আমার পছন্দ।
আর হ্যাঁ, রাতে আমি নিরামিষ খাই। লুচি আলুরদম, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা আর ঘন দুধ হলেই চলবে।
ঠিক শুনছি তো, নাকি ভুল শুনলাম!
ঠিকই শুনেছ।
হার্টফেল করে মরে না যাই!
তুমি মরলে বিদ্যাধরপুরের পাঁচুগোপাল আছে। তবে তোমাকে আমার বেশি সরেস মনে হয়েছিল। কিন্তু তেমন বুকের পাটা...
কে বললে নেই! আপনার মেনুর সঙ্গে আরও দু'টো আইটেম যোগ করছি — পাতিলেবু আর কাঁচালঙ্কা।

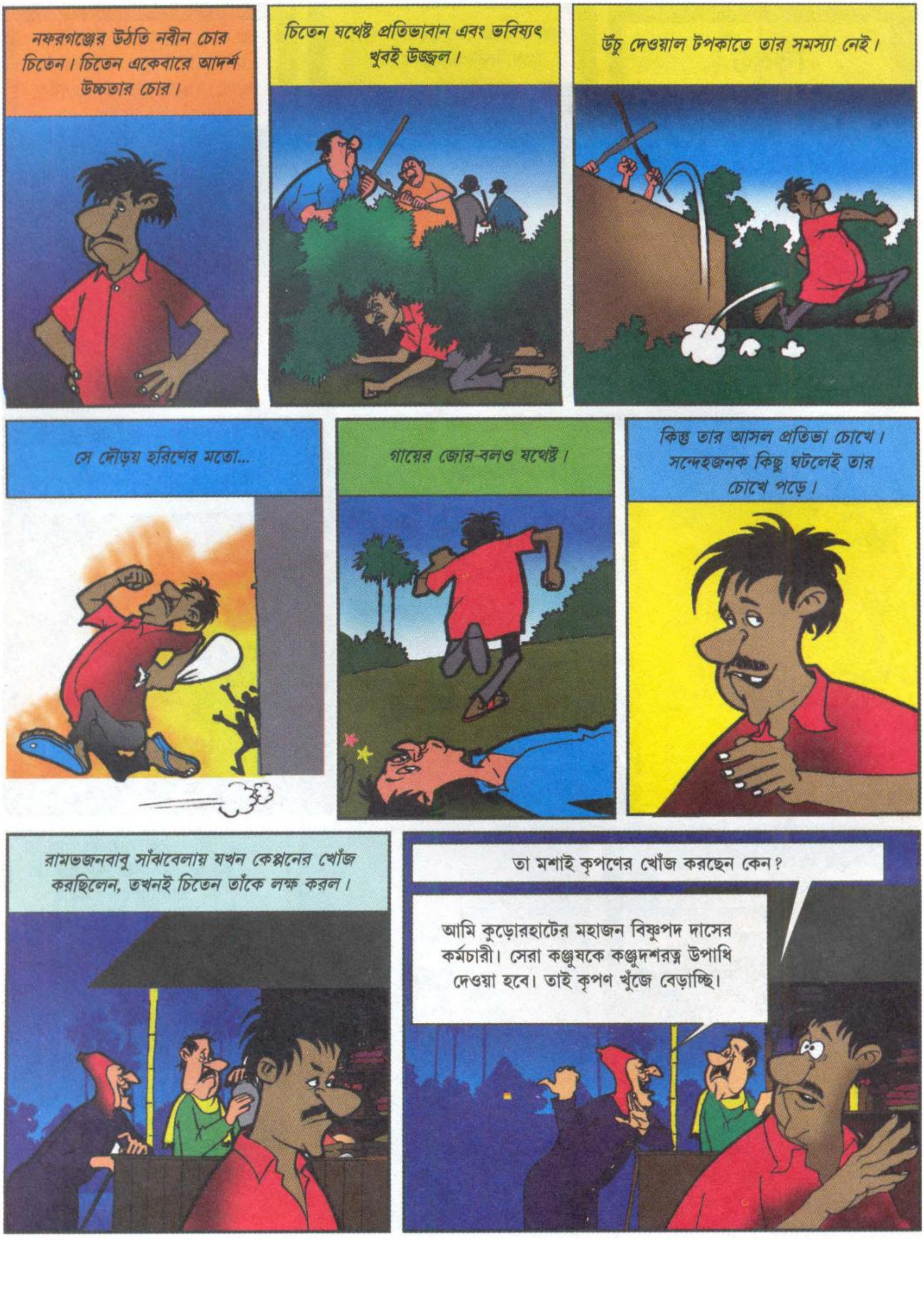
নফরগঞ্জের উঠতি নবীন চোর চিতেন। চিতেন একেবারে আদর্শ উচ্চতার চোর।
চিতেন যথেষ্ট প্রতিভাবান এবং ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।
উঁচু দেওয়াল টপকাতে তার সমস্যা নেই।
সে দৌড়য় হরিণের মতো...
গায়ের জোর-বলও যথেষ্ট।
কিন্তু তার আসল প্রতিভা চোখে। সন্দেহজনক কিছু ঘটলেই তার চোখে পড়ে।
রামভজনবাবু সাঁঝবেলায় যখন কেপ্পনের খোঁজ করছিলেন, তখনই চিতেন তাঁকে লক্ষ করল।
তা মশাই কৃপণের খোঁজ করছেন কেন?
আমি কুড়োরহাটের মহাজন বিষ্ণুপদ দাসের কর্মচারী। সেরা কঞ্জুষকে কঞ্জুদশরত্ন উপাধি দেওয়া হবে। তাই কৃপণ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছেন, আমাদের বিপ্‌নেকে নিয়ে যান।
রামভজনবাবুর আষাঢ়ে গল্পটা চিতেন মোটেই বিশ্বাস করেনি। তাই বিপিনবাবুর জানলায় সে আড়ি পাতল।
বিপিনের তিন মাসি কাশীবাসী, হাসিরাশি, হাসিখুশি। তিনজনেই আশির কোঠায়।
বিপিন তাঁদের নয়নের মণি। কিন্তু বিপিনের কিপটেমিতে তাঁদের ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা।
বিনা তেল-মশলার রান্না তাঁদের গলা দিয়ে নামে না।
চিতেন গোপনে মাসিদের বাজার করে দিয়ে যায় রোজ। এ বাড়িতে তার নিত্য যাতায়াত।

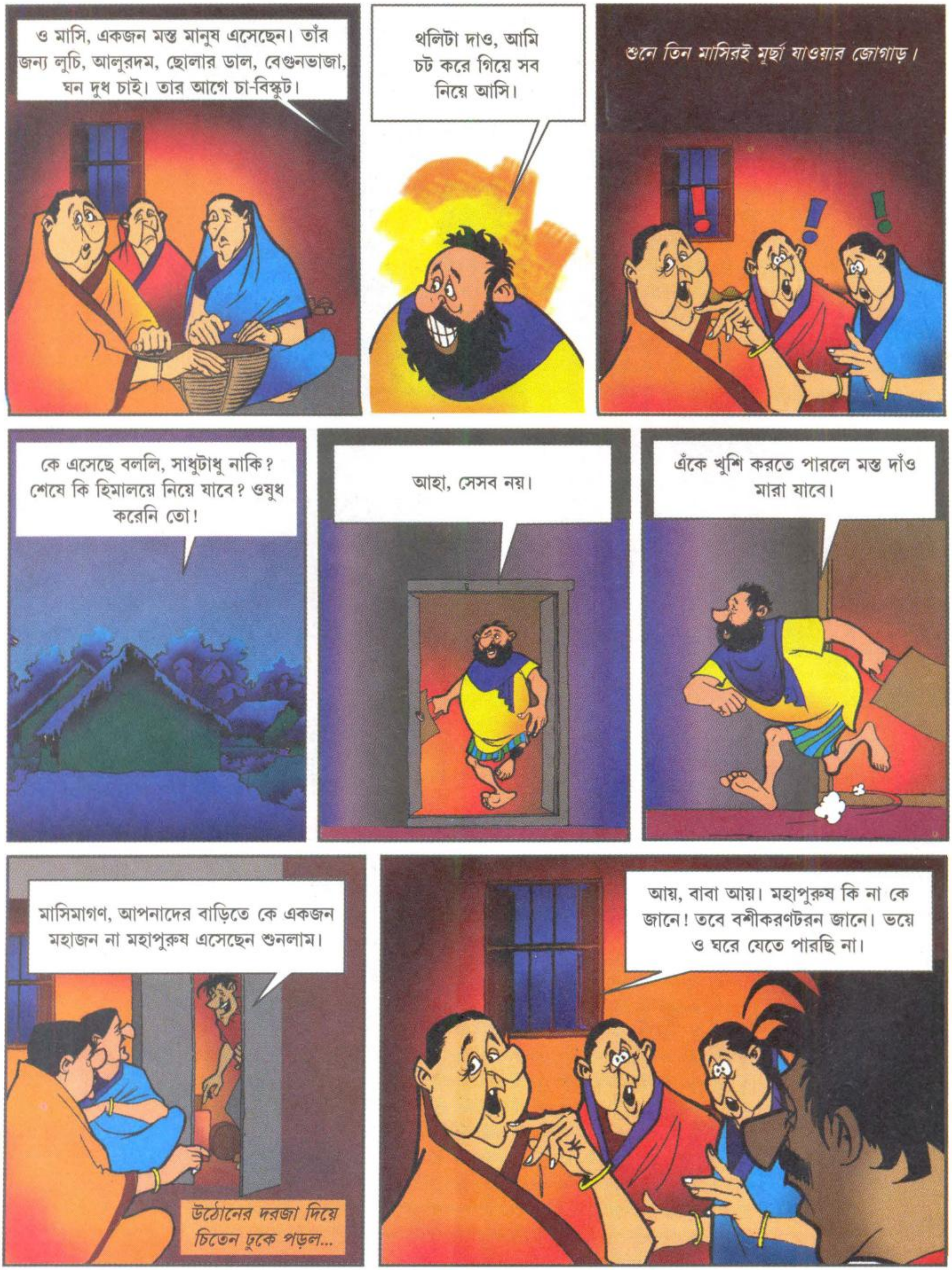
ও মাসি, একজন মস্ত মানুষ এসেছেন। তাঁর জন্য লুচি, আলুরদম, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, ঘন দুধ চাই। তার আগে চা-বিস্কুট।
থলিটা দাও, আমি চট করে গিয়ে সব নিয়ে আসি।
শুনে তিন মাসিরই মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়।
কে এসেছে বললি, সাধুটাধু নাকি? শেষে কি হিমালয়ে নিয়ে যাবে? ওষুধ করেনি তো!
আহা, সেসব নয়।
এঁকে খুশি করতে পারলে মস্ত দাঁও মারা যাবে।
মাসিমাগণ, আপনাদের বাড়িতে কে একজন মহাজন না মহাপুরুষ এসেছেন শুনলাম।
উঠোনের দরজা দিয়ে চিতেন ঢুকে পড়ল...
আয়, বাবা আয়। মহাপুরুষ কি না কে জানে! তবে বশীকরণটরন জানে। ভয়ে ও ঘরে যেতে পারছি না।

মাসিমাগণ, ঘাবড়াবেন না, আমি গিয়ে বাজিয়ে দেখে আসছি।
চিতেন ঘরে ঢুকে দরকচা মেরে যাওয়া ভজনবাবুর বয়স আন্দাজ করতে পারল না।
তুমি আবার কে হে?
আজ্ঞে, আমাকে এ বাড়ির কাজের লোক বলে ধরতে পারেন।
কী সর্বনাশ! কৃপণের বাড়িতে কাজের লোক!
আজ্ঞে, আমি বিনিমাইনে আর খাইখোরাকির লোক।
তা কী মনে করে আগমন?
মাসিরা জানতে পাঠালেন, আপনার সেবার দরকার আছে নাকি? একটু গা-হাত-পা টিপে দেওয়া বা আঙুল মটকানো...

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

দুবরাজপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (বীরভূম)

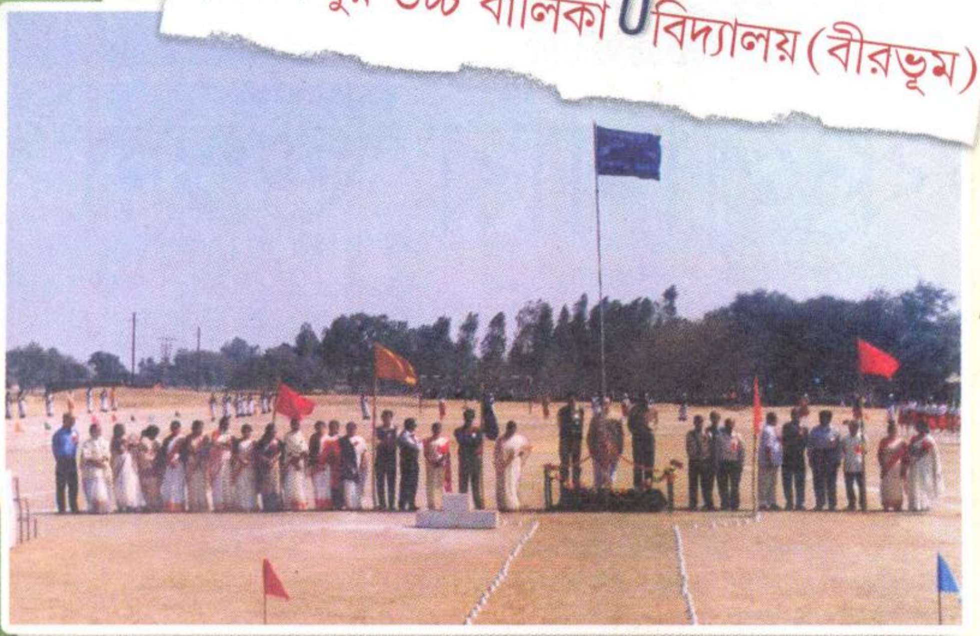

আমাদের স্কুল

আমাদের স্কুল তৈরি হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। শিক্ষিকাদের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ছাত্রীদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সব কিছুতেই আমরা অংশ নিই। আমাদের স্কুলে কম্পিউটারও শেখানো হয়।

কবিপ্রণাম

আমাদের স্কুলে 'কবিপ্রণাম' একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রতি বছর ২৫ বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করা হয় আমাদের স্কুলে। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া এবং তাঁর লেখা কবিতা আবৃত্তি করা হয়। ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে বিশ্বকবির প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

শিক্ষক দিবসে

৫ সেপ্টেম্বর আমাদের দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। এই দিনটি শিক্ষক দিবস। প্রতি বছর আমরা মর্যাদার সঙ্গে এই দিনটি পালন করি। স্কুলে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই উপলক্ষে।

শীতের মেলায়

প্রতি বছর শীতকালে আমরা পিকনিক করতে যাই। পিকনিকে দারুণ মজা হয়। সবাই মিলে আনন্দ করা আর সঙ্গে দেদার পেটপুজো, সবই উপভোগ করি। সারা বছর আমরা এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করি। একদিনের স্মৃতি সারা বছর আমাদের আনন্দ দেয়।

সরস্বতী পুজো

বাগদেবীর আরাধনায় আমরা মেতে উঠি প্রতি বছর। পুজোর আগের দিন আমরা ছাত্রীরা একসঙ্গে মণ্ডপসজ্জার কাজ শুরু করি। পুজোর কাজে আমাদের পাশে সব সময়ই থাকেন স্কুলের শিক্ষিকারা। পুজোর দিনটি শুধুই জমাটি মজা, সঙ্গে ভূরিভোজও চলে।

তৃণা দাস *দ্বাদশ শ্রেণি*

ঘোষণা

নিজেদের স্কুলকে দেখতে চাও 'আনন্দমেলা'র ক্যাম্পাসের পাতায়? তা হলে ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও আমাদের দপ্তরে, সঙ্গে ভাল রঙিন ফোটো পাঠিও কিন্তু! লেখাটি স্কুলের প্রধানকে দিয়ে প্রত্যয়িত করে নিতে ভুলো না। আমাদের ঠিকানা:

আনন্দমেলা
ক্যাম্পাস বিভাগ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

কৃষ্ণলামার গুম্ফা

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

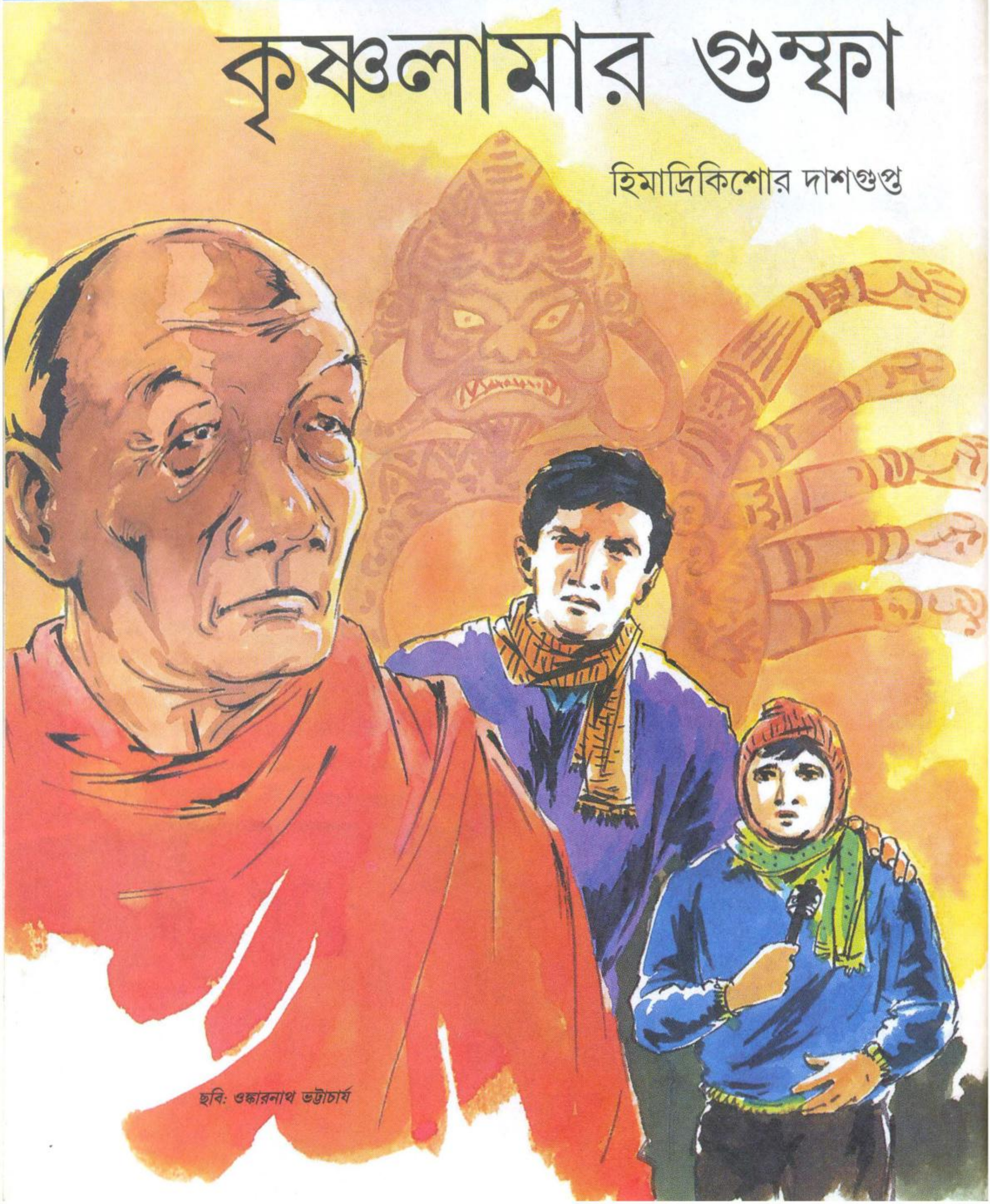

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সম্পূর্ণ উপন্যাস

এক সংখ্যায় সমাপ্ত

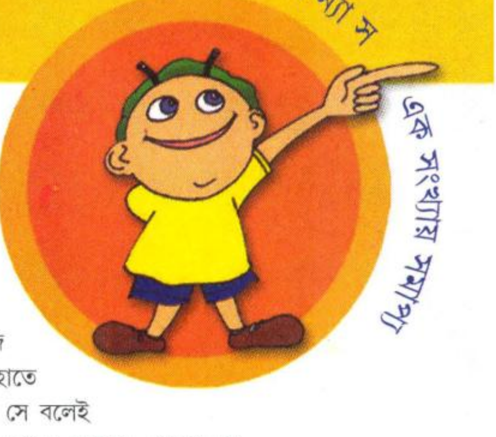

চকোলেটে একটা কামড় বসিয়ে শুভম বলল, "আচ্ছা নীলাঞ্জনকাকু, ওগুলো কী?"

শুভমের ঠিক পাশে বসে একটা গাইড বুকের পাতা উলটে যাচ্ছিল নীলাঞ্জন। মাথা তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "কোনটা?"

শুভম বলল, "ওই যে রাস্তার বাঁকে, লম্বা-লম্বা বাঁশের গায়ে কাপড় টাঙানো আছে!"

নীলাঞ্জন উত্তর দিল, "ওগুলোকে বলে, 'লুংদার'। এখানকার পাহাড়ি মানুষরা ভূত-প্রেত-অপদেবতা বিশ্বাস করে। তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে স্থানীয় মানুষরা পথের বাঁকে বা নির্জন স্থানে এই পতাকাগুলো টাঙিয়ে রাখে। কাছে গেলে দেখতে পাবে, ওগুলোর গায়ে তিব্বতি হরফে মন্ত্র লেখা আছে।"

শুভম বলল, "আমি যখন বাবার সঙ্গে ভুটানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখনও এরকম অনেক পতাকা দেখেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, এগুলো আসলে ভূত তাড়ানোর পতাকা।"

শুভমের কথা শুনে এবার হেসে ফেলল নীলাঞ্জন। তারপর বলল, "হ্যাঁ, অনেকটা ওরকমই।"

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। আকাশের গায়ে ছড়িয়ে আছে তার লাল আভাটুকু। পাহাড়ের বুকে সন্ধ্যা নামছে। চারপাশের পাহাড়ের চূড়োগুলো ঢেকে যাচ্ছে ঘন কুয়াশায়। ধীরে-ধীরে গাড়িটা নামছে নীচের দিকে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে ঠান্ডা বাতাস। নীলাঞ্জন বলল, "শুভমবাবু, এইবার কাচটা উঠিয়ে দাও, নইলে ঠান্ডা লেগে যাবে।"

চকোলেটটা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল শুভমের। তার মোড়কটা হাত বাড়িয়ে বাইরে ফেলে জানলার কাচটা তুলে দিল। তারপর সিটে গা এলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গ্যাংটক পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

নীলাঞ্জন বলল, "আরও ঘণ্টাখানেক।"

শুভমের প্রশ্নের কারণটা মনে-মনে ধরতে পারল নীলাঞ্জন। গত কালই তারা কলকাতা থেকে গ্যাংটক এসেছেন। আর আজ ভোরবেলা তারা বেরিয়ে পড়েছে ফুদুং মনাস্ট্রি দেখবে বলে। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে এখন তারা ফিরছে। গত কাল সন্ধ্যায় নীলাঞ্জন গ্যাংটকে হোটেলের বাইরে বাজারে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিল। গ্যাংটকের রাস্তায় বেশ কয়েকটা কিউরিও শপ আছে। ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তারই একটায় শুভমকে নিয়ে ঢুকেছিল নীলাঞ্জন।

সেখানে নানা জিনিসের সঙ্গে কাচের শোকেসের মধ্যে রাখা ছিল বেশ কয়েকটা জপযন্ত্র। জপযন্ত্র হল একটা কাঠের দণ্ডের মাথায় লাগানো ঢাকনা দেওয়া কৌটোর মতো একটা জিনিস। তার গায়ে তিব্বতি ভাষায় মন্ত্র খোদাই করা থাকে। আর কৌটোটার সঙ্গে সুতো বা ধাতব চেন দিয়ে একটা পাথর বা ধাতুর ছোট টুকরো ঝোলানো থাকে। দণ্ডটা হাতে নিয়ে নাড়ালে ধাতুর টুকরোটা ঘুরতে থাকে, আর তার সঙ্গে দণ্ডের উপর লাগানো কৌটোটাও ঘুরতে থাকে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ওই যন্ত্র হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ'— এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ওরকম একটা যন্ত্র কাল কিউরিও শপ থেকে কেনার ইচ্ছে হয়েছিল শুভমের। কিন্তু সম্ভবত নীলাঞ্জনের কাছে আবদার করতে সঙ্কোচ হয়েছিল তার। আজ ফুদুং মনাস্ট্রিতে ছোট-ছোট ছেলের হাতে জপযন্ত্র দেখে কথাটা শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলেছে নীলাঞ্জনকে। নীলাঞ্জন তাকে বলেছে, সন্ধেবেলা গ্যাংটকে ফিরে তাকে একটা জপযন্ত্র কিনে দেবে। তারপর থেকে শুভম অন্তত চারবার তাকে প্রশ্ন করেছে, গ্যাংটকে ফিরতে তাদের কতক্ষণ লাগবে।

অন্ধকার আস্তে-আস্তে গাঢ় হচ্ছে। ড্রাইভার গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল। নীলাঞ্জন সিটের উপর গা এলিয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগল শুভমের বাবা-মায়ের কথা। আমেরিকায় এখন সবে সকাল হয়েছে। হয়তো ঘুম থেকে উঠে তারা তৈরি হচ্ছে বাইরে যাওয়ার জন্য। শুভমের বাবা-মা দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শুভমের বাবা ডঃ অনিরুদ্ধ সান্যালের কাছেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের শিল্পচর্চা নিয়ে গবেষণার কাজ করছে নীলাঞ্জন পাঁচ বছর ধরে। আর সেই গবেষণার প্রয়োজনেই দিন সাতেকের জন্য সিকিমে এসেছে সে।

সিকিমের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে প্রায় একশোটি গুম্ফা বা মনাস্ট্রি। ওগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি মনাস্ট্রি তিন-চারশো বছরেরও বেশি প্রাচীন। আর এই মনাস্ট্রিতে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও দেওয়ালচিত্রের অমূল্য নিদর্শন। ওই সব নিদর্শন সম্বন্ধে জানতে আর প্রয়োজনমতো সেগুলো ক্যামেরাবন্দি করতেই নীলাঞ্জনের এখানে আসা। শুভম তার সঙ্গে এখানে এসেছে ঘটনাচক্রে।

শুভমের এখনও দশ বছরে পা দেওয়া হয়নি। ওদের বাড়িতে যাতায়াতের সূত্রে নীলাঞ্জনের সঙ্গে খুব ভাব শুভমের। নীলাঞ্জনকেও ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করেন ওর বাবা-মা। দিনদশেক আগে হঠাৎই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা সেমিনারে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছয় শুভমের বাবার কাছে। হাতে মাত্র সাত দিন সময়। শুভমের বাবা-মা'র পাসপোর্ট থাকলেও শুভমের পাসপোর্ট এখনও করানো হয়নি। শুভমের বাবা আর নীলাঞ্জন দিনদু'য়েক ছোটাছুটিও করেছিলেন তার পাসপোর্টের জন্য। কিন্তু তাঁরা অবশেষে বুঝতে পারলেন, সরকারি লাল ফিতের ফাঁস গলে এত তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এদেশে। তারপর আছে ভিসার ব্যাপার। নিজেদের যাওয়াটা প্রায় বাতিলই করে দিচ্ছিলেন ডঃ সান্যাল। কারণ, কার কাছে তাঁরা রেখে যাবেন শুভমকে?

আত্মীয়স্বজন সকলেই প্রায় কলকাতার বাইরে থাকেন কাজের সূত্রে। আর, বাড়িতে লোক বলতে তো মাত্র তিন জন—স্বামী, স্ত্রী

আর ছেলে। কাজেই যাওয়াটা বাতিল করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তখন ডঃ সান্যালের সামনে। বলতে গেলে, শেষ পর্যন্ত শুভমই সমাধান করেছিল সমস্যার। দিনছয়েক আগে সন্ধেবেলায় এসব নিয়েই কথা হচ্ছিল শুভমদের বাড়িতে। নীলাঞ্জনও উপস্থিত ছিল সেখানে। কথা প্রসঙ্গে উঠে এসেছিল নীলাঞ্জনের সিকিমে আসার ব্যাপারটাও। ডঃ সান্যালও তাকে বোঝাচ্ছিলেন, এখানে কী কী কাজ তাকে করতে হবে।

শুভমও ঘরের মধ্যে বসে শুনছিল সব কথা। তার বিদেশে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে মনমরা হয়ে বসে ছিল সে। আরও কষ্ট পাচ্ছিল। কারণ, সে বুঝতে পারছিল তার জন্যই তার বাবা-মাও যেতে পারছেন না। নীলাঞ্জনের সিকিমে আসার ব্যাপারটা কয়েক মাস আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধেবেলায় সিকিমের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা শুনতে-শুনতে হঠাৎই একটা আশ্চর্য প্রস্তাব দিয়েছিল সে, "আচ্ছা বাবা, আমি নয় নীলাঞ্জনকাকুর সঙ্গে গ্যাংটক বেড়িয়ে আসি। আর তোমরা আমেরিকা যাও।"

নীলাঞ্জনের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ডঃ সান্যালের আর তাঁর স্ত্রীর মনে। আর, শুভম নীলাঞ্জনকে খুব ভালবাসে। কাজেই পরদিনই ফাইনাল হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। তিন দিন আগে শুভমের বাবা-মা আমেরিকা যাওয়ার জন্য মুম্বইয়ের ফ্লাইট ধরেছিলেন । আর তার পরদিন সন্ধেবেলায় শুভম দার্জিলিং মেলে চেপে বসল নীলাঞ্জনের সঙ্গে।

চোখ বন্ধ করেই নীলাঞ্জন প্রশ্ন করল, "শুভম, বাবা-মা'র জন্য তোমার মন খারাপ করছে না?"

শুভম বলল, "একটু একটু করছে ঠিকই, তবে এখানে এসে লাগছেও দারুণ।"

নীলাঞ্জন আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, "আজ সারা দিনে কোন জিনিসটা তোমার সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে?"

শুভম তার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল গাড়িটা। আচমকা গাড়িটা ব্রেক কষায় নীলাঞ্জন হুমড়ি খেয়ে পড়ল ড্রাইভারের সিটের পিছনে। কপালটা খুব জোরে ঠুকে গেল সিটের সঙ্গে। গাড়ির হেড লাইট অন্ধকারের বুক চিরে সামনের দিকে পড়েছে। সেই আলোয় নীলাঞ্জন দেখতে পেল, একটা ছোট ছেলে গাড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে আর আঙুল দিয়ে রাস্তার পাশে কী দেখাচ্ছে। ছেলেটি লম্বায় ঠিক শুভমের মতোই হবে, হয়তো বা বয়সেও সেই রকমই হবে। ওর নেড়া মাথা, গায়ে একটা হাতকাটা জোব্বা।

নীলাঞ্জন একবার তাকিয়ে দেখল শুভমের দিকে। সে ঠিকই আছে, একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে মাত্র। নীলাঞ্জন শুভমকে জিজ্ঞেস করল "তোমার লাগেনি তো!"

শুভম উত্তর দিল, "না।"

ইতিমধ্যে ড্রাইভার দরজা খুলে নীচে নেমে পড়েছে। ছেলেটা যেদিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল, সেদিকে একবার তাকাল সে, তারপর ইশারায় নীলাঞ্জনকেও নামতে বলল। নীলাঞ্জন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। তার সঙ্গে-সঙ্গে শুভমও। ততক্ষণে ড্রাইভার সেই ছোট ছেলেটার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়েছে রাস্তার পাশে পাহাড়ের ঢালের কাছে। নীলাঞ্জন সেদিকে এগিয়ে গেল, আর শুভম দাঁড়িয়ে রইল গাড়ির পাশে। ড্রাইভার আর ছেলেটির কাছে গিয়ে চমকে গেল নীলাঞ্জন। অন্ধকারের মধ্যে একটা মানুষ শুয়ে আছে আর তার মুখ দিয়ে গোঙানির মতো একটা শব্দ বের হচ্ছে। অন্ধকারের জন্য ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না লোকটিকে। নীলাঞ্জন পকেট থেকে লাইটারটা বের করে জ্বালাল। একটু আলো হল জায়গাটায়। সেই ক্ষীণ আলোয় সে দেখল, একজন বৃদ্ধ লামা শুয়ে আছেন সেখানে, প্রায় অচৈতন্য অবস্থায়। মাথাটা তিনি মাঝে-মাঝে একটু নাড়ছেন আর গোঙাচ্ছেন। নীলাঞ্জন নিচু হয়ে লাইটারটা আরও কাছে নিয়ে যেতেই দেখতে পেল, লোকটির ঠিক উরুর কাছে একটা মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন। আর, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। সম্ভবত এই কারণেই গোঙাচ্ছেন মানুষটি। নেড়া মাথা ছোট ছেলেটি এবার দুর্বোধ ভাষায় কী সব বলতে শুরু করল। নীলাঞ্জন ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটি কী বলছে?"

ড্রাইভার লোকটি নেপালি। সে জানাল, সেও ছোট ছেলেটির কোনও কথা বুঝতে পারছে না। ছেলেটি সম্ভবত তিব্বতি ভাষায় কথা বলছে। কারণ, গ্যাংটকের রাস্তায় তিব্বতি লামাদের সে এই ধরনের ভাষায় কথা বলতে শুনেছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, লামাটি তো বটেই, বাচ্চা ছেলেটিও সম্ভবত তিব্বতি। ছেলেটিও বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, তার ভাষা অন্য কেউ বুঝছে না। তাই সে এবার লামার দিকে একবার আঙুল দেখাল, তারপর আঙুল দেখাল বেশ কিছুটা নীচে গ্যাংটক শহরের দিকে। এবার তার কথা বুঝতে পারল নীলাঞ্জন। সে আহত লামাকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে বলছে। এখন কী করা যায়? নীচে নিয়ে যেতে তো অসুবিধে নেই! কিন্তু অন্য কোনও হাঙ্গামায় না পড়তে হয়! একমাত্র গ্যাংটকের যে হোটেলে নীলাঞ্জনরা উঠেছে, সেই হোটেলের বাঙালি ম্যানেজার ভদ্রলোক ছাড়া কারও সঙ্গেই নীলাঞ্জনের পরিচয় নেই গ্যাংটকে। কাজেই লামাকে নিয়ে কোনও বিপদে পড়লে নীলাঞ্জনকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। অথচ তাঁকে আর ছোট ছেলেটিকে এখানে এই অবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে ফেলে যেতেও মানবিকতায় বাধছে নীলাঞ্জনের।

সে শুভমকে গাড়ির মধ্যে উঠে বসতে বলে কী করা যায় তা আলোচনা করতে লাগল। ড্রাইভার লোকটি ভাল বলেই মনে হয়। সেও বুঝে উঠতে পারছিল না, এখন কী করা উচিত! হঠাৎ সেই ছোট ছেলেটি একটা কাণ্ড করে বসল। সে দৌড়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল গাড়ির চাকার ঠিক সামনে, আর উত্তেজিতভাবে কী যেন সব চিৎকার করে বলতে লাগল। ইতিমধ্যে এসব দেখে ভয় পেয়ে গাড়ি থেকে নীচে নেমে পড়েছে শুভম। সে এসে দাঁড়াল নীলাঞ্জনের পাশে।

নীলাঞ্জনরা বুঝতে পারল, এখন লামা আর ছোট ছেলেটিকে তাদের সঙ্গে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। নইলে ছেলেটি উঠবে না গাড়ির সামনে থেকে। তাই ড্রাইভার প্রথমে লম্বা একটা কাপড় গাড়ি থেকে এনে প্রথমে লামাটির ক্ষতস্থানের উপর বেঁধে দিল। তারপর সে আর নীলাঞ্জন মিলে ধরাধরি করে কোনওরকমে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল গাড়ির পিছনের সিটে। লামাটির পাশে পড়ে ছিল একটা ছোট কাপড়ের

পুঁটলি। ছোট ছেলেটি রাস্তা থেকে উঠে সেই কাপড়ের পুঁটলিটা তুলে নিয়ে গিয়ে বসল লামাটির পাশে।

শুভম খেয়াল করল, পুঁটলির ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে একটা জপযন্ত্র। এর পর নীলাঞ্জন শুভমকে নিয়ে উঠে বসল ড্রাইভারের পাশের সিটে। গাড়ি আবার নামতে শুরু করল নীচের দিকে। এখন উপর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গ্যাংটক শহরের আলোগুলো। গাড়ি পাহাড়ি পথে এক-একটা বাঁক নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সেই আলো। শুভমের খুব ভাল লাগছিল নীচের দিকে তাকিয়ে থাকতে। পকেট হাতড়ে আর-একটা চকোলেট বের করল শুভম। তার মোড়কটা খুলে মুখে দেওয়ার আগে সে পিছনে তাকাল একবার। গাড়ির মধ্যে একটা হাল্কা নীল আলো জ্বলছে। সেই আলোয় শুভম দেখল, ছোট ছেলেটি বৃদ্ধ লামাকে জড়িয়ে ধরে বসে জুলজুল চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় শুভম হাতের চকোলেট বারটা এগিয়ে দিল তার দিকে। ছেলেটি একটু ইতস্তত করার পর হাত বাড়িয়ে নিল সেটা, তারপর নাকের কাছে এনে একবার শুঁকল। গন্ধটা মনে হয় ভাল লাগল। তার মুখে ফুটে উঠল একটা ক্ষীণ হাসির রেখা। চকোলেটটা আস্তে-আস্তে খেতে শুরু করল ছেলেটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল আলো ঝলমলে গ্যাংটক শহরে।

গ্যাংটকে পৌঁছে ড্রাইভার প্রথমে তাদের নিয়ে গেল একটা হাসপাতালে। শুভম দেখল, হাসপাতালের মাথার উপর নিয়ন বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে লেখা— 'সিকিম স্টেট জেনারেল হসপিটাল'। বৃদ্ধ লামাকে ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল নীলাঞ্জন ও গাড়ির ড্রাইভার। ছেলেটিও পুঁটলিটা সঙ্গে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। তারপর একবার শুভমের দিকে তাকিয়ে হেসে ঢুকে গেল হাসপাতালের ভিতর। শুভম একলা বসে রইল গাড়ির মধ্যে। মিনিট কুড়ি পর নীলাঞ্জন আর ড্রাইভার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে চেপে বসল গাড়িতে। আহত লামাকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নীলাঞ্জনের কাছ থেকে একথা জানতে পারল শুভম।

গাড়ি এবার ছুটে চলল হোটেলের দিকে। মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই হোটেলের সামনে পৌঁছে গেল তারা। গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে যখন শুভমরা হোটেলের ভিতরে ঢুকল, তখন নীলাঞ্জনের ঘড়িতে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় আটটা বাজে। দোতলায় নিজেদের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল দু'জনেই। আর বাইরে যেতে ইচ্ছে হল না কারও। রাত ন'টা নাগাদ রুম সার্ভিস খাবার দিয়ে গেল। গরম-গরম মুরগির মাংস আর ভাত খেয়ে সেদিনের মতো লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল দু'জনে। নীলাঞ্জন বেড সুইচ টিপে ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকার ঘরে লেপের আরামে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম নেমে এল দু'জনের চোখে।

॥ ২ ॥

ভোরবেলা দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নীলাঞ্জনের। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে দেখল, ঠিক সাতটা বাজে। কাল রাতে সে বেয়ারাকে বলে রেখেছিল, সাতটার সময় তাকে ডেকে দেওয়ার জন্য। নিশ্চয় সে-ই ডাকতে এসেছে। খাট থেকে নেমে দরজা খুলতেই নীলাঞ্জন দেখল, তার অনুমানই সত্যি। বেয়ারা তাকে দেখে বলল, "গুড মর্নিং স্যার।"

নীলাঞ্জন বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।" এর পর বেয়ারাটা অন্য দিকে চলে গেল। নীলাঞ্জন দরজাটা বন্ধ করে কাচের জানলার সামনে গিয়ে ভারী পরদাটা সরিয়ে দিল। সকালের নরম আলোয় ভরে গেল গোটা ঘর। পাইন বনের মাথার উপর দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে তুষারাবৃত হিমালয় পর্বতমালা। তার দুর্লঙ্ঘ্য শিখরগুলো যেন ছুঁতে চাইছে মাথার উপরের ঘন নীল আকাশ। ঠিক যেন এক টুকরো পিকচার পোস্ট কার্ড ভেসে উঠছে নীলাঞ্জনের চোখের সামনে। মিনিটদশেক সেই দৃশ্য উপভোগ করার পর নীলাঞ্জন ডাক দিল শুভমকে। লেপটা সরিয়ে চোখ ডলতে-ডলতে খাটের উপর উঠে বসল শুভম। নীলাঞ্জন বলল, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হবে শুভমবাবু, আটটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

খাট থেকে নামতে-নামতে শুভম প্রশ্ন করল, "আজ আমরা কোথায় যাব নীলাঞ্জনকাকু?"

নীলাঞ্জন বলল, "আজ আমরা প্রথমে যাব রুমটেক গুম্ফা বা

সি পি এমের ভোটে জেতার কৌশল নিয়ে সাহসী সাংবাদিক প্রবীর ঘোষালের বই
সি পি এমের রিগিং ৫০
ভূমিকা লিখেছেন সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত
ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উপন্যাস সম্ভার
ঐতিহাসিক উপন্যাস সমগ্র
৫৯২ পাতা, ৫টি উপন্যাস, দামী কাগজ। এখন ২০০
এখন মাত্র ১০০ টাকায় সুদৃশ্য, বোর্ড বাঁধাই
সাংবাদিক অনুপম অধিকারী-র
চলুন বেড়িয়ে আসি
কোথায়, কিভাবে যাবেন, থাকবেন, দেখবেন, খরচ—সঙ্গে ম্যাপ, ছবি, চার্ট, ট্রেকিং রুট ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। একবার কিনলে আজীবন ভ্রমণ।
বাংলায় সেরা হতে রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়ের
ভাবসম্প্রসারণ সমগ্র ৪০ সমাস সমগ্র ২৫
সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ সমগ্র ২৫
সমার্থক শব্দ ৪০ বিপরীতার্থক শব্দ ৫০
মুখার্জি পাবলিশিং ৮বি/২ টেমার লেন, কল-৯
২২৪১২০৯৭/৯৪৩৩১৩৮৪১০/৯৯০৩১৭৮৪৮৬

ভিন্ন স্বাদের, পছন্দের বই মানেই 'রানার'
পিনাকী ভাদুড়ী থ্রি চিয়ার্স ফর
বীরবল গোপাল ভাঁড় মোল্লা নাসিরুদ্দিন ৯০
বুদ্ধির রাজা বীরবল ৩২ রসসম্রাট গোপাল ভাঁড় ৩৫
মোল্লা নাসিরুদ্দিন জিন্দাবাদ ৩৫
মৃগাঙ্কমৌলি চৌধুরীর বই
কীভাবে বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলবেন ২৫
থাকলে মনে লাগবে কাজে ৬০
ছোটদের সেরা কুইজ ৩০ চেনা গাছ অচেনা গুণ ১৮
শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ৩৮
বিবেকানন্দ বলছেন ৩৫
অজয় বেরা অঙ্ক যখন বুদ্ধি বাড়ায় (অখণ্ড) ১০০
কমল চক্রবর্তী অঙ্ক নিয়ে খেলা (১,২) ৫০
ভিন দেশের গল্প ৪৫ ছুটির সন্দেশ ৫০
ছোটদের সেরা রচনা ৩০
মাধ্যমিক অবজেকটিভ গণিত ৫৫
রানার ১৩সি, কলেজ রো, কল-৯ ✆ ২২৪১-৮৬৫২

ছোটোদের গল্পসমগ্র সিরিজ
নবনীতা দেব সেন ১৫০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১২০
তারাপদ রায় ১২০
অদ্রীশ বর্ধনের
টারজান ফিরে এল ১৩০
হিমানীশ গোস্বামীর
জীবরামের গল্প ৬০
সুপ্রিয় ঠাকুরের
দারুচিনি দ্বীপের রহস্য ৪০
লালমাটি / সূর্য পাবলিশার্স
দূরভাষ: ৯৮৩১০২৩৩২২
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

মনাস্ত্রি দেখতে। তারপর আবার দুপুরে হোটেলে ফিরে খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ব পাহাড়ের মাথার উপর এনচে গুম্ফা দেখতে।"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্নান সেরে গরম জামাকাপড় গায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে নিল দু'জনে। নীলাঞ্জন টেবিলের উপর রাখা তার ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। তারপর জ্যাকেটের ঢাউস পকেটে টেবিল থেকে নোটবুকটা নিয়ে ঢোকাতে যেতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। কাল রাতে গাড়ি থেকে নামার সময় নিজের ছোট কিট ব্যাগটা আর গাড়ি থেকে নামানো হয়নি। ভাগ্য ভাল, ক্যামেরা ও নোটবুকটা তার সঙ্গেই ছিল, আর দামি কোনও জিনিস ছিল না তার মধ্যে। থাকার মধ্যে ছিল গোটাকতক বিস্কুটের প্যাকেট, দু'টো মিনারেল ওয়াটারের বোতল আর গাইড বুকটা। গাইড বুকটা নীলাঞ্জন হোটেলের সামনের বুক স্টল থেকে কিনেছিল, দরকার হলে সেখান থেকে আর-এক কপি কিনে নিতে পারবে সে। কিন্তু ক্যামেরা আর নোটবুকটা চলে গেলে সত্যিই তার বড় ক্ষতি হয়ে যেত।

ঘরের দরজায় তালা বন্ধ করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে এক তলায় নেমে এল নীলাঞ্জনরা। সিঁড়ির পাশেই ডাইনিং রুম। কাচের দরজা ঠেলে ডাইনিং রুমের ভিতরে ঢুকে একটা টেবিলের দু' পাশে মুখোমুখি বসল নীলাঞ্জন আর শুভম। মিনিট তিনেকের মধ্যেই টেবিলে এসে গেল প্লেটভর্তি বাটার টোস্ট, চারটে করে হাফ-বয়েল ডিম, নীলাঞ্জনের জন্য এক কাপ চা আর শুভমের জন্য বড় এক গ্লাস দুধ। মিনিট পনেরো লাগল তাদের ব্রেকফাস্ট শেষ হতে। তার পর হাতমুখ ধুয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য রিসেপশনের পাশ দিয়ে যেতেই হঠাৎ ম্যানেজারবাবু হাঁক দিলেন, "ও মশাই, শুনছেন?"

নীলাঞ্জন ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। ম্যানেজারবাবু বললেন, "কাল গাড়িতে আপনি কিট ব্যাগটা ফেলে এসেছিলেন। রাত দশটা নাগাদ ড্রাইভার এসে ব্যাগটা ফেরত দিয়ে গিয়েছে। আপনারা ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে তখন আর আপনাদের বিরক্ত করিনি। এই নিন আপনার ব্যাগ।" বলে নীল রঙের কিট ব্যাগটা কাউন্টার থেকে তিনি বাড়িয়ে দিলেন নীলাঞ্জনের দিকে। নীলাঞ্জন ব্যাগটা নিয়ে ধন্যবাদ জানাল তাঁকে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে হোটেলের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

নীলাঞ্জনদের হোটেল থেকে বেশ কিছুটা নীচে ট্যাক্সিস্ট্যান্ড। এখানে ট্যাক্সি বলতে মারুতি ভ্যানকে বোঝায়। ঢালু পথ বেয়ে শুভমকে নিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করল নীলাঞ্জন। সে মনে-মনে ভাবল, ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে যদি কালকের গাড়িটাকে পাওয়া যায়, তা হলে ভাল হবে। কালকের ড্রাইভার খুব ভাল লোক ছিল। নইলে কষ্ট করে লামা আর ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেত না। আর, তার ব্যাগটাও হোটেলে ফেরত দিতে আসত না। কিন্তু কাল নীলাঞ্জন স্ট্যান্ড থেকে তার গাড়ি ভাড়া করেনি। চলন্ত গাড়িকে রাস্তায় হাঁক দিয়ে থামিয়েছিল। কাজেই তাকে স্ট্যান্ডে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে নীলাঞ্জনের মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু শুভম আর নীলাঞ্জন ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে পৌঁছতেই কালকের মাঝবয়সি ড্রাইভার তাদের দেখেই এগিয়ে এল। তারপর মিনিটখানেকের মধ্যেই তারা রওনা হল রুমটেক গুম্ফার দিকে।

গাড়িতে উঠবার কিছুক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরিয়ে কিট ব্যাগের চেনটা খুলল নীলাঞ্জন। হ্যাঁ, ভিতরের সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। কিন্তু এটা কী? এটা তো তার নয়! জিনিসটা ব্যাগের বাইরে বের করল নীলাঞ্জন। একটা জপযন্ত্র! ড্রাইভারকে নীলাঞ্জন জিজ্ঞেস করল, জপযন্ত্রটা সে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়েছে কি না। সে জানাল, সে-ই ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়েছে সেটা। নীলাঞ্জনদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার ঘণ্টাখানেক পর সে দেখতে পায়, গাড়ির পিছনের সিটে নীলাঞ্জনদের ব্যাগটা রয়ে গিয়েছে। আর ব্যাগটার পাশে সিটের উপর পড়ে আছে জপযন্ত্রটাও। তাই সে সেটা নীলাঞ্জনদেরই মনে করে কিট ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে ব্যাগটা হোটেলে দিয়ে এসেছিল।

জপযন্ত্রটা হাতে নিয়ে ভাল করে একবার দেখল নীলাঞ্জন। জিনিসটা যে বেশ পুরনো, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দৈর্ঘ্যে ইঞ্চি পনেরো হবে। কাঠের হাতলের মাথার উপর বসানো গোল কৌটোটা সম্ভবত রুপোর বলেই মনে হল নীলাঞ্জনের। কৌটোর গায়ে নানা ধরনের নকশা আঁকা, আর তার মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট সবুজ পাথর বসানো। জিনিসটার বেশ দাম হবে, মনে-মনে ভাবল নীলাঞ্জন। শুভম পাশে বসে দেখছিল নীলাঞ্জনের হাতের জপযন্ত্রটা। সে এবার বলল, "নীলাঞ্জনকাকু, আমার হাতে একটু দাও না জিনিসটা!"

নীলাঞ্জন তার হাতে দিল জিনিসটা। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ল, কাল শুভমকে একটা জপযন্ত্র কিনে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফেরার পথে ওই ঝামেলাটায় জড়িয়ে যাওয়ার জন্য আর কিনে দেওয়া হয়নি।

শুভম কয়েকবার ঘুরিয়ে দেখল জপযন্ত্রটা। যন্ত্রটা ঘোরালেই একটা মৃদু রিনিরিনি শব্দ বের হচ্ছে যন্ত্রটার ভিতর থেকে। জপযন্ত্রটা দেখতে-দেখতে শুভম বলল, "জানো নীলাঞ্জনকাকু, কাল ছেলেটার হাতে যে পুঁটলিটা ছিল, তার মধ্যে একটা জপযন্ত্র ছিল।"

শুভমের কথা শুনে এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল নীলাঞ্জনের কাছে। কাল তা হলে নিশ্চয়ই ওই পুঁটলি থেকে সিটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল জপযন্ত্রটা। সঙ্গে-সঙ্গে সে গাড়ির মুখ হাসপাতালের দিকে ঘোরাতে বলল ড্রাইভারকে। নীলাঞ্জনের কথা শুনে ড্রাইভার একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নীলাঞ্জনের দিকে। হয়তো মনে-মনে সে ভাবল, ঝামেলাটা তো কালকেই মিটে গিয়েছে। তা হলে আজ আবার হাসপাতালে যাওয়া কেন! নীলাঞ্জনের কথা শুনে এর পর ড্রাইভার হাসপাতালের রাস্তা ধরল, আর মিনিটদশেক পরই নীলাঞ্জনরা এসে পৌঁছে গেল হাসপাতালের গেটের সামনে। শুভমের হাত থেকে জপযন্ত্রটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামল নীলাঞ্জন। আর তার পিছনে-পিছনে নামল শুভম।

নীলাঞ্জন হাঁটতে লাগল হাসপাতালের গেটের দিকে। হাসপাতাল চত্বর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চারপাশে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা ফুলের বাগান। চারদিক এতটা সুন্দর যে, কাল রাতে বুঝতে পারেনি নীলাঞ্জন। তা ছাড়া কাল রাতে গাড়ি এসে থেমে ছিল একেবারে হাসপাতালের দরজার সামনে। নীলাঞ্জনরা হাসপাতালের দরজার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে, ঠিক এমন সময় গলায় স্টেথো ঝোলানো, সাদা অ্যাপ্রন গায়ে একজন ভিতর

থেকে বেরিয়ে এলেন। নীলাঞ্জন তাঁকে চিনতে পারল। ভদ্রলোকের নাম ডাক্তার চৌধুরী। প্রায় কুড়ি বছর সিকিমে আছেন। কাল যখন তারা বৃদ্ধ লামাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল, তখন এই ডাক্তার চৌধুরীই ছিলেন আউটডোরের দায়িত্বে। সেই সূত্রে কাল মিনিটদশেক এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল নীলাঞ্জনের। ভদ্রলোক বাঙালি বলে সামান্য পরিচয় বিনিময়ও হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। সম্ভবত, ভদ্রলোক নাইট ডিউটি সেরে বাইরে এলেন। চোখেমুখে কেমন একটা ক্লান্তির ছাপ। ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নীলাঞ্জন বলল, "গুড মর্নিং ডাক্তার চৌধুরী।"

ডাক্তার চৌধুরী দাঁড়িয়ে পড়লেন।

নীলাঞ্জন বলল, "কালকের সেই লামার সঙ্গে আমি কি একটু দেখা করতে পারি?"

ডাঃ চৌধুরীর মুখের ভাব দেখে মনে হল, তিনি ধরতে পারলেন না নীলাঞ্জনের কথাটা। অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পরই তিনি বুঝতে পারলেন নীলাঞ্জন কী বলছে! তিনি এবার বললেন, "ও, আপনিই তো কাল রাতে নিয়ে এসেছিলেন লামা আর ছোট ছেলেটিকে। কিন্তু তাঁরা তো নেই, চলে গিয়েছেন।"

নীলাঞ্জন বলল, "চলে গিয়েছেন!"

ডাঃ চৌধুরী বললেন, "হ্যাঁ, চলে গিয়েছেন। বারোটা সেলাই হয়েছে পায়ে। আমরা রাখতে চেয়েছিলাম, তিনি থাকতে চাইলেন না। অসম্ভব মনের জোর মানুষটির।"

নীলাঞ্জন বলল, "কিন্তু আমরা যখন তাঁকে আনলাম, তখন তিনি তো কোনও কথাই বলতে পারছিলেন না। প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন!"

ডাঃ চৌধুরী বললেন, "আপনারা রেখে যাওয়ার পর ওঁকে কয়েকটা ইনজেকশন দিই, সেলাইও করি। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই বেশ কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। ওঁর ক্ষতটা প্রাথমিক অবস্থায় যতটা গুরুতর মনে হয়েছিল, ঠিক ততটা আসলে নয়। যদিও বারোটা সেলাই কম কথা নয়, তবে আঘাতটা প্রাণঘাতী ছিল না। আর পাহাড়ি মানুষদের সহ্যক্ষমতা এমনিতেই একটু বেশি হয়। জ্ঞান ফেরার পরই মানুষটি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাইছিলেন না। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গেই খোঁড়াতে-খোঁড়াতে চলে গেলেন।"

নীলাঞ্জন এবার প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, কোথায় গেলেন বলতে পারেন?"

ডাঃ চৌধুরী বললেন, "তা বলতে পারব না। এখানে দীর্ঘদিন থাকার ফলে তিব্বতি ভাষাটা আমি কিছুটা বুঝি। কারণ, অনেক সময় স্থানীয় মনাস্ট্রি থেকে লামারা এখানে আসেন চিকিৎসা করাতে। লামা আর ছেলেটির কথাবার্তা শুনে মনে হল, তাঁরা তিব্বত থেকে এসেছেন। কারণ, ছেলেটিকে লামাটি একবার বলছিলেন, 'এখানে থেকে সময় নষ্ট করা যাবে না, কাজ শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেদের দেশে ফিরে যেতে হবে।' নিজেদের দেশ বলতে সাধারণত লামারা তিব্বতকেই বোঝান। আর-একটা কথা, ছেলেটিকে একবার আমি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাতে সে বলেছিল, সে নাকি স্রোঙচেন বংশের সন্তান! আরও কী একটা সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বৃদ্ধটি তাকে ইশারায় থামিয়ে দেন। দেখুন, তাঁরা হয়তো তিব্বতের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন! আচ্ছা আমি এখন চলি, নমস্কার।" এই বলে

হাসতে-হাসতে, ঘাড় নাড়তে-নাড়তে ডাঃ চৌধুরী আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

ডাঃ চৌধুরীর কথা শোনার পর অগত্যা গাড়িতে ফিরে এল নীলাঞ্জন আর শুভম। গাড়ি এবার চলতে শুরু করল রুমটেক মনাস্ট্রির দিকে। শুভম এবার নীলাঞ্জনকে প্রশ্ন করল, "ডাক্তারবাবু যে স্রোঙ্‌চেন বংশের কথা বললেন, সেটা কী?"

নিজের গবেষণার কাজের সুবাদে এ-ব্যাপারে কিছুটা জানা আছে নীলাঞ্জনের। সে বলল, "অনেক বছর আগে তিব্বতে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম ছিল স্রোঙ্‌চেন-সগেম-পো। ওই রাজার বংশধররা পরবর্তীকালে তাঁর নাম অনুসারে স্রোঙ্‌চেন বংশ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাজা স্রোঙ্‌চেন-এর হাত ধরেই তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়েছিল।"

নীলাঞ্জনের কথা শুনে শুভম চোখ বড়-বড় করে বলল, "সে কী! দেড় হাজার বছর আগের সেই রাজবংশের ছেলেরা এখনও বেঁচে আছে!"

শুভমের কথা শুনে নীলাঞ্জন হেসে ফেলে বলল, "দেড় হাজার বছর পর কোনও রাজার বংশধরদের বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু বংশপরিচয় প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। হয়তো ছেলেটা কোনও প্রাচীন প্রবাদ শুনে থাকবে, তাই ওভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছে।"

শুভম আবার প্রশ্ন করল, "বংশপরিচয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় কেন?"

নীলাঞ্জন তার উত্তরে ব্যাপারটা সহজ ভাষায় তাকে বোঝাতে লাগল। নানা কথা বলতে-বলতে এক সময় এসে উপস্থিত হল রুমটেক মনাস্ট্রির সামনে।

রুমটেক মনাস্ট্রি গ্যাংটকের সবচেয়ে বড় মনাস্ট্রি। ধর্মগুরু গিয়ালোয়া লাসান চেনপো এই মনাস্ট্রি নির্মাণ করেছিলেন তিব্বতে অবস্থিত কাগ্যেয়ু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদর দপ্তরের অনুকরণে। রংচঙে এই মনাস্ট্রির ঠিক পিছনে সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীনালন্দা ইনস্টিটিউট। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তৈরি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সারা পৃথিবী থেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা আসেন অধ্যয়ন করতে। ওখানেই এক 'গে-শো' অর্থাৎ লেকচারারের সঙ্গে দেখা করার কথা নীলাঞ্জনের। তাঁর জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নীলাঞ্জন গবেষণার কাজ করছে, সেখানকার বিভাগীয় প্রধানের একটা চিঠিও এনেছে সঙ্গে করে। গে-শো'র সঙ্গে নীলাঞ্জনের পরিচয় না থাকলেও পত্রদাতার যোগাযোগ আছে। নীলাঞ্জনকে গে-শো'র বৌদ্ধ শিল্পকলার বিষয়ে কয়েকটি বই ও ফোটোকপি দেওয়ার কথা। এ-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে ইতিপূর্বেই নীলাঞ্জনদের চিঠি মারফত কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। গে-শো'র দেওয়া কাগজপত্র নীলাঞ্জনের গবেষণার কাজে লাগবে।

গাড়ি থেকে শুভমকে নিয়ে নীলাঞ্জন যখন মনাস্ট্রির প্রবেশ দ্বারের সামনে নামল, তখনও জপযন্ত্রটা নীলাঞ্জনের হাতে। গাড়ি থেকে নেমেই শুভম বলল, "নীলাঞ্জনকাকা, জপযন্ত্রটা আমার হাতে দাও না!"

নীলাঞ্জন জপযন্ত্রটা শুভমের হাতে দিয়ে বলল, "সাবধানে রেখে দাও জিনিসটা, আমরা সিকিমে আরও চার দিন থাকব। যদি লামা আর ছোট ছেলেটির সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যায়, তা হলে জিনিসটা ফেরত দিতে হবে। তোমাকে তো একটা জপযন্ত্র কিনেই দেব বলেছি।"

নীলাঞ্জন মনে-মনে ভেবে নিল, আগে মনাস্ট্রির ভিতরটা শুভমকে নিয়ে দেখে তারপর সে দেখা করতে যাবে গে-শো'র সঙ্গে। তাই শুভমকে নিয়ে সে ঢুকল মনাস্ট্রির সামনের পাথর বাঁধানো বিশাল চত্বরে। চত্বরের দু' পাশে লামাদের থাকার জন্য সার-সার ঘর। সকালের নরম আলো এসে পড়েছে চত্বরে। অনেক ছোট-ছোট শিক্ষার্থী লামা ছড়িয়েছিটিয়ে বসে আছে এখানেওখানে। আর কয়েকজন বয়স্ক লামা কাঠের বালতিতে জল নিয়ে পরিষ্কার করছে চার পাশ। চত্বরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাথরের স্তম্ভ। শুভম সেটা দেখে প্রশ্ন করল, "ওটা কী?"

নীলাঞ্জন বলল, "একে বলে 'চোর্তেন'। এর গায়ে মঠের স্থপতির নাম লেখা আছে।"

চত্বর পেরিয়ে শুভমরা প্রবেশ করল মনাস্ট্রির মধ্যে। বিশাল প্রার্থনাকক্ষে রাখা আছে শাক্যমুনি বুদ্ধের বিশাল মূর্তি। আর তার দু' পাশে রয়েছে মারিপুত্র ও মঙ্গলপুত্রের মূর্তি। এ ছাড়া সারা দেওয়াল জুড়ে রয়েছে এক হাজার ছোট-ছোট বুদ্ধমূর্তি। প্রার্থনাকক্ষের থাম আর সিলিং অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। সিলিং থেকে নীচের দিকে ঝুলছে সোনা-রুপো দিয়ে নকশা আঁকা নানারঙের কাপড় বা থাংকা। বুদ্ধমূর্তির সামনে জ্বলছে সার-সার ঘিয়ের প্রদীপ। মূর্তির সামনে একটা কাঠের স্তম্ভের গায়ে লম্বা হলুদ কাপড়ের ফালি বাঁধছে লামারা। নীলাঞ্জন শুভমকে বুঝিয়ে দিল, "ওগুলোকে বলে 'ধাগা'। আমরা যেমন মন্দিরে মালা দিই, তেমনই ওরাও মূর্তির সামনে ধাগা চড়ায়।"

সব কিছু অবাক হয়ে দেখতে লাগল শুভম। এর পর ওরা উঠে গেল দোতলায়। সেখানে একই ঘরে রাখা আছে এই মঠের ষোলোজন প্রয়াত প্রধান বা কর্ণাপা'র কালো টুপি। নীলাঞ্জন একটা বইয়ে পড়েছে যে, বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন, এই টুপিগুলো দেখলে তাঁদের নাকি আর পুনর্জন্ম হয় না।

মনাস্ট্রি দেখতে-দেখতে প্রায় ঘণ্টাদেড়েক কেটে গেল। নীলাঞ্জন এর মধ্যে বেশ কিছু ছবি তুলল আর নোট নিল নিজের ডায়েরিতে। তারপর চলল শ্রীনালন্দা ইনস্টিটিউটে গে-শো'র সঙ্গে দেখা করতে। গে-শো'র নাম ডাবডি লামা। নালন্দা ইনস্টিটিউটের শিক্ষাব্যবস্থা আবাসিক। ইনস্টিটিউটের ঠিক সামনেই একদল লামা দাঁড়িয়ে ছিল। বয়সে তারা যুবক। হয়তো এখানকারই ছাত্র হবে। নীলাঞ্জন তাদের "ডাবডি লামার সঙ্গে দেখা করতে চাই," বলতেই তাদেরই একজন নীলাঞ্জনদের ইনস্টিটিউটের দোতলায় ডাবডি লামার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। ডাবডি লামার বয়স বছর ষাটেক হবে। চোখে মোটা কাচের চশমা। একটা চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে রাখা পুঁথির পাতা উলটে যাচ্ছিলেন তিনি। নীলাঞ্জনকে দেখে প্রথমে একটু আশ্চর্য হলেন। নীলাঞ্জন তার পরিচয় আর চিঠিটা দেওয়ার পর ইশারায় সামনে রাখা একটা চেয়ারে নীলাঞ্জনকে বসতে বললেন তিনি।

ভদ্রলোক খুব কম কথা বলেন। চিঠিটা পড়ার পর তিনি মিনিট তিনেক সৌজন্যমূলক কিছু কথা বললেন নীলাঞ্জনের সঙ্গে। তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে ঘরের কোনায় রাখা একটা আলমারির ভিতর থেকে কাগজে মোড়া কিছু বইপত্র এনে নীলাঞ্জনের হাতে দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বিদায় জানালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীলাঞ্জন আর শুভম গাড়িতে চেপে বসল হোটেলে ফেরার জন্য।

॥ ৩ ॥

দুপুরে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে বিকেলে নীলাঞ্জন আবার তৈরি হল বেরিয়ে পড়ার জন্য। নিজের গ্লাভ্‌স আর মাফলার কিট ব্যাগে ঢোকাতে-ঢোকাতে শুভমকে সে বলল, "শুভম, তোমার গ্লাভ্‌সজোড়া সঙ্গে নাও, আর পশমের কানঢাকা টুপিটাও এই ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নাও। সন্ধে নামলেই বাইরে খুব ঠান্ডা পড়বে।"

জানুয়ারি মাসের শেষ দিক। বেশ ঠান্ডা এখন এখানে। গত কাল রাতে হোটেলে ফেরার সময় বেশ শীত করছিল নীলাঞ্জনের। শুভম নীলাঞ্জনের কথামতো তার গ্লাভ্‌সজোড়া ঢুকিয়ে দিল ব্যাগে। খাটের উপর পড়ে ছিল জপযন্ত্রটা। শুভম বলল, "এটা আমি সঙ্গে নেব নীলাঞ্জনকাকু?"

নীলাঞ্জন বলল, "নাও।"

হোটেলের ঘরে তালা দিয়ে এর পর নীচে নেমে এল শুভমরা। হোটেলের বাইরে বেরিয়ে শুভম দেখল, তাদের লাল রঙের মারুতিটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। রুমটেক থেকে ফেরার সময় নীলাঞ্জনের সঙ্গে ড্রাইভারের কথা হয়ে গিয়েছে। গ্যাংটকে যে ক'টা দিন তারা থাকবে, সেই ক'দিন তারা এই গাড়িতেই বেড়াবে। শুভমকে দেখেই হাসল ড্রাইভার। শুভম এর মধ্যেই তার নাম জেনে গিয়েছে, বীরবাহাদুর ছেত্রী। শুভমদের হোটেলের ঠিক পিছন থেকে একটা সবুজ পাহাড় উঠেছে আকাশের দিকে। নীচ থেকে পাহাড়ের মাথার উপরে একটা টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। নীলাঞ্জন শুভমকে টাওয়ারটা দেখিয়ে বলল, "ওই টেলিফোন টাওয়ারের ওখানে আমাদের এখন যেতে হবে। পাহাড়ের উপর ওই টাওয়ারের কাছেই রয়েছে এন্‌চে মনাস্ট্রি।"

গাড়ির সামনে এসে শুভম বলল, "আমি সামনে বসব।"

নীলাঞ্জন বলল "বসে পড়ো।"

গাড়ি তাদের নিয়ে পাকদণ্ডী বেয়ে উপর দিকে উঠতে শুরু করল। আস্তে-আস্তে যত উপরে উঠতে লাগল তারা, ততই ঘন হয়ে উঠতে লাগল রাস্তার পাশের মেপ্‌ল আর পাইন গাছের জঙ্গল। রাস্তায় কোনও লোকজন নেই। মাঝে-মাঝে এক-একটা গাড়ি উপর থেকে নেমে এসে শুভমদের গাড়ির পাশ দিয়ে আরও নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। গাড়িগুলোয় যারা বসে আছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা টুরিস্ট। মনাস্ট্রি দেখে গ্যাংটক শহরের দিকে ফিরছে তারা। সেই গাড়ির মধ্যে বসে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে মাঝে-মাঝে হাত নাড়াচ্ছে শুভমকে দেখে। শুভমও হাত নাড়ছে। মিনিট কুড়ি পর এক সময় শুভমদের গাড়ি উঠে এল পাহাড়ের মাথায়। ড্রাইভার তাদের টেলিফোন টাওয়ারের সামনে এক জায়গায় নামিয়ে দিল। জায়গাটায় আরও গোটা দুই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এর পর আর গাড়ি যাওয়ার অনুমতি নেই। সেখান থেকে একটা পথ সামনের দিকে চলে গিয়েছে। আর, সেই পথের মুখে একটা গাছের গায়ে একটা সাইনবোর্ডে তিরচিহ্ন দিয়ে দিকনির্দেশ করে লেখা আছে, 'এন্‌চে মনাস্ট্রি'।

নীলাঞ্জন শুভমকে নিয়ে সেই পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। দু' পাশে বড়-বড় গাছের জঙ্গল, তার মধ্য দিয়ে পায়েচলা রাস্তা আস্তে-আস্তে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। মিনিটদশেক সেই পথ ধরে চলার পর জঙ্গল এক সময় পাতলা হয়ে এল। তারপর নীলাঞ্জনরা উপস্থিত হল একটা খোলা জায়গায়। এবার তাদের চোখে পড়ল কিছুটা দূরে একটা উঁচুমতো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এন্‌চে মনাস্ট্রি। তার চার দিকে বিরাট-বিরাট বাঁশের মাথায় উড়ছে নানারঙের লুংদার। মনাস্ট্রির এক দিকে পাইনের ঘন জঙ্গল, আর-এক দিকে অতলান্ত খাদ। যেদিকে খাদ, তার পাশ দিয়ে একটা পাথুরে রাস্তা গিয়ে উঠেছে মনাস্ট্রিতে। রাস্তার পাশে খাদের দিকটায় একটা ছোট প্রাচীরের গায়ে সার-সার হলুদ বর্ণের প্রার্থনাচক্র লাগানো আছে। হাত দিয়ে সেই প্রার্থনাচক্রগুলো ঘোরাতে-ঘোরাতে শুভমরা উঠে এল মনাস্ট্রির সামনের শানবাঁধানো প্রাঙ্গণে। সেখান থেকে চার দিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ তার আপন গাম্ভীর্য নিয়ে। যেদিকেই চোখ যায়, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। অনেক নীচে গ্যাংটক শহরের ঘরবাড়িগুলোকে দেখতে লাগছে ঠিক দেশলাই বাক্সের মতো। চারপাশ নিস্তব্ধ, আর তারই মাঝে দাঁড়িয়ে প্যাগোডা আকৃতির এন্‌চে মনাস্ট্রি। রুমটেক মনাস্ট্রির মতো এই মনাস্ট্রির চোখ ধাঁধানো জলুস নেই, তার পরিবর্তে আছে প্রাচীনত্বের গন্ধ।

নীলাঞ্জন শুভমকে বলল, "এই এন্‌চে গুম্ফা হল সিকিমের অন্যতম প্রাচীন গুম্ফা। এর বয়স দু'শো বছরেরও বেশি। নিয়েগমাপা সম্প্রদায়ের এক লামা, নাম দ্রুপ্তব কারপো এই গুম্ফা নির্মাণ করেছিলেন। কথা বলতে-বলতে শুভম আর নীলাঞ্জন ঢুকল মনাস্ট্রির ভিতরে। ভিতরটা বেশ অন্ধকার। বুদ্ধমূর্তির সামনে জ্বলছে সার-সার প্রদীপ। কয়েকজন লামা ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছেন ঘরের এক কোনায়, অন্ধকারের মধ্যে। আর গোটাদশেক ছোট ছেলে নিচু গলায় একসঙ্গে সুর করে কী বলে চলেছে, আর মাথা ঝাঁকাচ্ছে। বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও ঘরের মধ্যে রয়েছে ভয়ংকর দেখতে সব মূর্তি। দেখতে অনেকটা রাক্ষসের মতো। তাদের দিকে তাকিয়ে বেশ ভয় করছিল শুভমের। আছে বেশ কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও। একটা মূর্তি দেখে শুভম চিনতে পারল, সেটি ছিন্নমস্তার। বইয়ের পাতায় এর ছবি দেখেছে শুভম। নীলাঞ্জন শুভমকে নিয়ে প্রার্থনাকক্ষের চার দিকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। চার পাশে ছড়িয়ে আছে অদ্ভুত সব হস্তশিল্পের নিদর্শন। ছবি তুলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু নীলাঞ্জন জানে, প্রার্থনাকক্ষের ভিতরে এই মঠগুলোয় কোনও কিছুর ছবি তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিছুক্ষণ প্রার্থনাকক্ষের ভিতরে থাকার পর বাইরে বেরিয়ে এল নীলাঞ্জন। মঠের বাইরে এক জায়গায়, দেওয়ালের গায়ে বেশ কিছু রংচঙে ছবি আছে। ছবিগুলো জাতক কাহিনির। বৌদ্ধ শিল্পরীতিতে আঁকা। সেই দেওয়ালচিত্রগুলোর বেশ কিছু ছবি নিল সে। শুভম তার হাতের জপযন্ত্রটা ঘোরাতে-ঘোরাতে চার দিকের সব কিছু দেখতে লাগল। মনাস্ট্রির এক পাশে ছোট-ছোট নিচু ছাদওলা বেশ কয়েকটা কাঠের ঘর। তার সামনে কয়েকটি ছোট ছেলে পায়রাদের গম খাওয়াচ্ছে।

শুভম তাদের দেখে নীলাঞ্জনকে প্রশ্ন করল, "ওদের বাবা-মা নেই?"

নীলাঞ্জন উত্তর দিল, "আছে। ওদের বাবা-মায়েরা ওদের এখানে রেখে গিয়েছেন ধর্মশিক্ষার জন্য।" নীলঞ্জন একটা বইয়ে পড়েছে যে, অনেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তাঁদের ছেলেদের শৈশবে এই এনচে মনাস্ট্রিতে পাঠান তন্ত্রশিক্ষার প্রাথমিক পাঠ নেওয়ার জন্য। বিশেষত, নিয়েগমাপা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে এই এনচে মঠ তন্ত্রসাধনার অন্যতম পীঠস্থান বলে বিবেচিত হয়। নীলাঞ্জন আর শুভম ঘুরতে-ঘুরতে মনাস্ট্রির পিছন দিকে চলে এল। কয়েক হাত দূরেই শুরু হয়েছে দেবদারু আর পাইনের ঘন জঙ্গল। চার দিক অসম্ভব নিস্তব্ধ। মাঝে-মাঝে বাতাসে মড়মড় শব্দ উঠছে জঙ্গল থেকে। জঙ্গল আর মনাস্ট্রির ঠিক মাঝখানে একফালি ফাঁকা জমির মধ্যে একটা বসবার পাথরের বেদি রয়েছে। নীলাঞ্জন শুভমকে নিয়ে বসল সেই বেদির উপর। বেলা আস্তে-আস্তে পড়ে আসছে। মনাস্ট্রির মাথার উপর আকাশের বুকে জেগে থাকা শৃঙ্গগুলো আস্তে-আস্তে লাল হতে শুরু করেছে। সেদিকে তাকিয়ে শুভম বলল, "দ্যাখো, কী সুন্দর!"

নীলাঞ্জন বলল, "হ্যাঁ, সত্যিই অপূর্ব!" তারপর শুভমকে প্রশ্ন করল "আচ্ছা, তোমার ওই পাহাড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না?"

শুভম উত্তর দিল, "করে। আমি যখন বড় হব, তখন ওই পাহাড়ে উঠব। তুমি ওই পাহাড়ের মাথায় উঠতে পারবে?"

নীলাঞ্জন বলল, "না, ওর জন্য আলাদা ট্রেনিং নিতে হয়। অনেক মনের জোর আর সাহসের প্রয়োজন হয়।"

শুভম এবার জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, যাঁরা এখানে থাকেন, তাঁরা ওখানে ওঠেন?"

নীলাঞ্জন বলল, "এ-ব্যাপারে তোমাকে একটা মজার কথা শোনাই। অধিকাংশ সিকিমের মানুষই কিন্তু পাহাড়ের মাথায় পা রাখেন না। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেন, পাহাড়ের মাথায় অপদেবতারা বাস করে। পাহাড়ে উঠলে সেই সব অপদেবতার ঘুম ভেঙে যায়। তখন তারা রেগে গিয়ে বন্যা-ঝড়-বৃষ্টি-মহামারী ইত্যাদি দুর্যোগ নামিয়ে আনে। সাধারণত এই ভয়েই পাহাড়ের মাথায় সিকিমিজ়রা পা রাখেন না।"

একটু থামল নীলাঞ্জন, তারপর শুভমকে বলল, "আর-একটা কথা বলি তোমাকে, এই এনচে মনাস্ট্রি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই লামা দ্রুপ্তবকারপো নাকি একজন বড় তান্ত্রিক ছিলেন। শোনা যায়, তিনি নাকি আকাশে উড়তে পারতেন। এখানকার লামারা বলেন যে, দ্রুপ্তবকারপো নাকি এখান থেকে উড়ে যেতেন ওই সব পর্বত শৃঙ্গের মাথায়।"

শুভম বলল, "সত্যি-সত্যি তিনি উড়তে পারতেন?"

নীলাঞ্জন বলল, "এখানকার লামারা অন্তত তাই বিশ্বাস করেন। চলো, এবার উঠি। একটু পরেই আস্তে-আস্তে সন্ধে নামতে শুরু করবে। এখন বেশ ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে।"

শুভম বলল "হ্যাঁ চলো।"

নীলাঞ্জন আর শুভম উঠে দাঁড়াল ফিরে যাওয়ার জন্য। ঠিক তখনই তাদের পিছন থেকে একটা প্রশ্ন ভেসে এল ইংরেজিতে, "আপনারা কি টুরিস্ট?"

কথাটা কানে যেতেই চমকে পিছনে ফিরে তাকাল নীলাঞ্জন আর শুভম। তারা দেখল, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মধ্যবয়সি মুণ্ডিতমস্তক এক লামা। গায়ে তাঁর লাল রঙের হাতকাটা একটা ছোট জামা। হাঁটুর কিছুটা নিচ পর্যন্ত ঢাকা লাল লুঙ্গির মতো পোশাক 'সারং'। পায়ে, গোড়ালির বেশ খানিকটা উপর পর্যন্ত ওঠা চামড়ার কালো জুতো। সবচেয়ে বিস্ময়কর তাঁর গায়ের রং। একদম কালো, যা লামাদের মধ্যে দেখা যায় না। নীলাঞ্জন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। সেই লামা আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কি টুরিস্ট?"

প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে নীলাঞ্জন এবার বলল, "হ্যাঁ।"

লামা স্মিত হেসে বললেন, "কিন্তু যেভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আপনি মনাস্ট্রি দেখে বেড়াচ্ছেন, তাতে ঠিক সাধারণ টুরিস্ট বলে মনে হয় না আপনাকে! সাধারণ টুরিস্টরা রুমটেক, আর বড়জোর এই এনচে গুম্ফা দেখতে আসে। কিন্তু কাল আপনাকে আমি ফুদুং মনাস্ট্রিতে দেখেছি।"

নীলাঞ্জন তাঁর কথা শুনে বুঝল, তার উত্তরটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেননি লামা। তাই সে এবার তার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা খুলে বলল লামাকে, "আসলে বৌদ্ধ শিল্পকলা নিয়ে আমি একটা গবেষণা করছি। আর সেই সূত্রেই মনাস্ট্রিগুলো দেখতে এসেছি আমি।"

নীলাঞ্জন তাঁকে এবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এনচে গুম্ফাতেই থাকেন?"

লামা জবাব দিলেন, "না। গ্যাংটক শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে 'কবি' নামে একটা জায়গা আছে। কবি থেকে আরও দশ মাইল উত্তরে এক গুম্ফায় আমি থাকি। লোকে আমাকে ডাকে 'কৃষ্ণলামা' বলে। সেটা অবশ্য আমার গায়ের রঙের জন্য। আসলে আমার জন্ম হয়েছিল সিংহলের এক বৌদ্ধ পরিবারে। তাই আমার গায়ের রং অন্য লামাদের মতো পীত বর্ণের নয়, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের।"

একথা বলার পর কৃষ্ণলামা নীলাঞ্জনকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি এখানে আর ক'দিন থাকবেন?"

নীলাঞ্জন জবাব দিল, "দিনতিনেক। ফেন্‌সং আর পেমিয়াংশি মনাস্ট্রিটাও দেখে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। শুনেছি, ওই দু'টো গুম্ফায় অসাধারণ কিছু দেওয়ালচিত্র আছে।"

শুভম এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দু'জনের কথাবার্তা শুনছিল। তার হাতে ধরা ছিল জপযন্ত্রটা। কৃষ্ণলামার উপস্থিতির কারণেই হোক, আর মনের খেয়ালেই হোক, সে ঘোরাতে লাগল জপযন্ত্রটা। লামা এবার তাকালেন তার দিকে। হঠাৎই যেন কৃষ্ণলামার চোখ কয়েক মুহূর্তের জন্য আটকে গেল শুভমের হাতে ধরা জপযন্ত্রের উপর। কৃষ্ণলামা নীলাঞ্জনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে আপনার খুদে সঙ্গীর হাতের জপযন্ত্রটা আমি কি একবার দেখতে পারি?"

নীলাঞ্জন বলল "অবশ্যই।"

শুভমের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে কৃষ্ণলামা বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কী দেখলেন, তারপর আবার সেটা শুভমকে ফিরিয়ে দিলেন।

সন্ধে নামতে আর বেশি দেরি নেই, তাই নীলাঞ্জন কৃষ্ণলামার উদ্দেশে বলল, "আমরা তা হলে চলি। আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করে আছে। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগল।"

কথাটা বলে নীলাঞ্জন হাতজোড় করে কৃষ্ণলামাকে নমস্কার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কৃষ্ণলামা তাকে কিছুটা অবাক করে দিয়ে বললেন, "একটু দাঁড়ান, আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।"

নীলাঞ্জন একটু থমকে গিয়ে বলল, "কী প্রস্তাব?"

লামা এবার বললেন, "আপনি এসেছেন বৌদ্ধ শিল্পকলা সম্বন্ধে জানতে। কিন্তু আমি জানি, আপনি এখনও পর্যন্ত মনাস্ট্রিগুলোয় যা দেখেছেন বা ভবিষ্যতে দেখবেন, তা বৌদ্ধ শিল্পকলার অতি সাধারণ নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বৌদ্ধ শিল্পকলার মূল ভিত্তি হল নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিহারের শিল্পরীতি। ওই দুই জায়গা থেকেই তিব্বত ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল বৌদ্ধ শিল্পকলা। পরবর্তীকালে অবশ্য বৌদ্ধ শিল্পকলা তার স্বাতন্ত্র্য হারায়। নষ্ট হয়ে যায় তার মৌলিকত্ব। কিছু-কিছু মনাস্ট্রিতে এখনও অবশ্য বৌদ্ধ শিল্পকলার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কিছু নিদর্শন রক্ষিত আছে। কিন্তু সেসব নিদর্শন মনাস্ট্রিগুলো চুরি যাওয়ার ভয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখে। কারণ, ওই সব অতি প্রাচীন বস্তুর দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কোটি-কোটি টাকা। তাই লোকচক্ষুর সামনে এসব জিনিস বের করা হয় না। আমি যে মঠের মঠাধ্যক্ষ, সেই মঠেও বেশ কিছু প্রাচীন শিল্পকলার নির্দশন আছে। আগামী পরশু তিব্বতি ক্যালেন্ডার বা লুনার ক্যালেন্ডারের দশম মাসের উনত্রিশতম দিন। ওই দিনে আমাদের মনাস্ট্রিতে ধর্মীয় উৎসব 'ছাম' বা মুখোশ নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। ওই দিন প্রতি বছর সকালে মাত্র এক দিনের জন্য মনাস্ট্রিতে রক্ষিত দুর্মূল্য সামগ্রীগুলো আমরা বাইরে বের করি কিছু সময়ের জন্য। আপনি যদি দু' দিনের জন্য আমার এখানে অতিথি হন, তা হলে ওসব সামগ্রী আমি আপনাকে দেখানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এমনকী, তাদের ছবিও আপনি তুলতে পারেন।"

কৃষ্ণলামার প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে গেল নীলাঞ্জন। প্রস্তাবটা যে নীলাঞ্জনের পক্ষে লোভনীয়, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু লামাই বা হঠাৎ নীলাঞ্জনকে এই সুযোগ করে দিতে চাইছেন কেন! নীলাঞ্জন সরাসরি প্রশ্ন করল লামাকে, "একজন অপরিচিতকে আপনি সেসব দেখাবেন কেন?"

কৃষ্ণলামা হেসে বললেন, "প্রথমত, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার দিক থেকে আমাদের মনাস্ট্রির ক্ষতির কোনও কারণ নেই, অর্থাৎ আপনি নিশ্চয়ই ওই দুর্মূল্য বস্তুগুলো চুরি করার চেষ্টা করবেন না। দ্বিতীয়ত, আপনি বৌদ্ধ শিল্পকলার বিষয়ে গবেষণা করছেন, এটা একজন বৌদ্ধ হিসেবে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আর তৃতীয়ত, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি নিশ্চয়ই বাঙালি। বাঙালিদের আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ, তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তেমনই বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন একজন বাঙালি। তাঁর নাম, লামা-তারানাথ বা তারানাথ তান্ত্রিক। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন তাঁর নাম। আজ থেকে বহু বছর আগে সাধনার উচ্চমার্গে পৌঁছনোর যে পথ লামা-তারানাথ দেখিয়েছিলেন, আমরা আজও সেই পথ অনুসরণ করি। তাই বাঙালিদের আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি।"

লামার কথা শোনার পর নীলাঞ্জন শেষ পর্যন্ত মত দিল তাঁর প্রস্তাবে। কারণ, তাতে নীলাঞ্জনের লাভই হবে কাজের ক্ষেত্রে। লামার চেহারাটা একটু অন্যরকম হলেও তাঁকে খারাপ লোক বলে মনে হচ্ছে না। কীভাবে কৃষ্ণলামার গুম্ফায় যেতে হবে, তা লামার কাছ থেকে বুঝে নিল নীলাঞ্জন। ঠিক হল, কাল দুপুরবেলা কবি ছাড়িয়ে একটা জায়গায় থাকবে নীলাঞ্জনরা। সেখানে কৃষ্ণলামা তাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। সেখান থেকে কৃষ্ণলামা তাদের নিয়ে যাবেন তাঁর গুম্ফায়। সেখানে দু' রাত কাটিয়ে নীলাঞ্জনরা ফিরে আসবে গ্যাংটকে। অবশ্য তার পরের দিনই নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে সন্ধেবেলায় কলকাতা ফেরার ট্রেন ধরতে হবে।

কৃষ্ণলামার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে। নীলাঞ্জন কৃষ্ণলামাকে তার গাড়িতে গ্যাংটক শহর অবধি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলল। কিন্তু তার প্রস্তাবে রাজি হলেন না লামা। নীলাঞ্জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অন্ধকার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলেন। হয়তো তার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামার কোনও রাস্তা আছে। আর, নীলাঞ্জনরা যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তাতেই ফিরে চলল গাড়ির দিকে।

॥ ৪ ॥

গ্যাংটক থেকে কবির উদ্দেশে নীলাঞ্জনরা যখন রওনা হল, তখন বেলা একটা বাজে। শুভম বসেছে ড্রাইভারের পাশে, আর নীলাঞ্জন বসেছে পিছনের সিটে। শুভম তার হাতের জপযন্ত্রটা ঘোরাতে-ঘোরাতে চার পাশ দেখতে-দেখতে চলেছে। নীলাঞ্জন একটা জিনিস লক্ষ করছে, জপযন্ত্রটা হাতে পাওয়ার পর থেকে শুভম কিছুতেই আর সেটাকে হাতছাড়া করছে না। কিন্তু জিনিসটা তো আসলে অন্যের, তাই মনের মধ্যে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে নীলাঞ্জনের। হয়তো লামা আর সেই ছেলেটি ওই জপযন্ত্রটার জন্য তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। গাড়ির ড্রাইভার কাল একটা অদ্ভুত কথা বলছিল এই জপযন্ত্রটার ব্যাপারে। সে বলছিল, নীলাঞ্জনদের নাকি ফেলে দেওয়া উচিত জিনিসটা। কারণ, এই সব জপযন্ত্রে নাকি লামারা তুকতাক করে রাখেন। কাজেই এই জপযন্ত্র অন্য কেউ সঙ্গে রাখলে নাকি তার ক্ষতি হতে পারে। শুভমকে জপযন্ত্রটা ঘোরাতে দেখে হঠাৎ কালকের ড্রাইভারের কথাটা মনে পড়ে গেল নীলাঞ্জনের। অবশ্য নীলাঞ্জন কথাটা বিশ্বাস করেনি। কারণ, পাহাড়ি লোকদের মনে নানা ধরনের কুসংস্কার কাজ করে।

গ্যাংটক শহর ছাড়িয়ে আস্তে-আস্তে উপর দিকে উঠতে শুরু করল নীলাঞ্জনদের গাড়ি। শুভম হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, কবিতে দেখার কিছু নেই?"

নীলাঞ্জন বলল, "আছে, তবে তা দেখতে হলে আমাদের দেরি হয়ে যাবে। তাই কবিতে আমরা দাঁড়াব না।"

শুভম আবার প্রশ্ন করল, "কবিতে কী আছে?"

নীলাঞ্জনের গাইড বুকের এক জায়গায় কবি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে। নীলাঞ্জন পড়েছে সেটা। সে শুভমকে বলল, "কবি একটা ঐতিহাসিক স্থান। আজ থেকে দু'শো বছর আগে কবিতে লেপ্চা প্রধান তে-কুং-তেক ও ভুটান রাজ খে-বুম-সার-এর মধ্যে দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক পাথরের গায়ে সেই সন্ধিচুক্তি খোদাই করা আছে। অনেকে ট্রেকিং করে সেই জায়গাটা দেখতে যায়।"

গ্যাংটক থেকে কবি বেশি দূরে নয়। এক ঘণ্টার মধ্যেই নীলাঞ্জনরা পৌঁছে গেল কবিতে। নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, গ্যাংটক ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা উপরে উঠে এসেছে তারা। যে রাস্তা দিয়ে তারা এতক্ষণ উপর দিকে উঠে এল, অনেক নীচে সেই রাস্তারই বাঁকগুলোকে উপর থেকে এখন দেখতে পাচ্ছে তারা। নীলাঞ্জনদের চার পাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আর, সেই পাহাড়ের গায়ে ওক, পাইন, রডোডেনড্রনের জঙ্গল। জায়গাটা খুব ঠান্ডাও। একটা বাঁকের কাছে এসে ড্রাইভার গাড়িটা থামিয়ে দিল। রাস্তা এবার দু' দিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। পিচের রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে ফৈনসং-এর দিকে। আর-একটা সরু পাথুরে রাস্তা ডান দিক দিয়ে নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। কোনওমতে একটা গাড়ি যেতে পারে সেই রাস্তা দিয়ে। সম্ভবত, সেটা পায়ে চলারই রাস্তা। গাড়িটা থামিয়ে ড্রাইভার পিছনে বসে থাকা নীলাঞ্জনের দিকে তাকাল। নীলাঞ্জন তাকে ডান দিকের রাস্তাটা ধরতে বলল।

ড্রাইভার ধীরে-ধীরে সেই রাস্তা ধরে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। রাস্তার এক দিকে পাহাড়, আর-এক দিকে গভীর খাদ। মিনিটদশেক চলার পর তারা আবার উপর দিকে উঠতে শুরু করল। নীলাঞ্জন মনে-মনে ভাবছিল, এখন যদি উলটো দিক থেকে একটা গাড়ি আসে, তা হলে কী হবে! রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ, যে-কোনও একটা গাড়িকে পিছু হঠতে হবে। অবশ্য সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কারণ, এই রাস্তায় গাড়ি তো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আরও প্রায় আধঘণ্টা চলার পর নীলাঞ্জনরা উঠে এল উঁচুমতো একটা ফাঁকা জায়গায়। সেখান থেকে একটা সুঁড়িপথ নেমে গিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। তবে সেই রাস্তায় গাড়ি থাকে না। কৃষ্ণলামার এখানেই নীলাঞ্জনদের নিতে আসার কথা। ড্রাইভার এখানটায় এসে আগে গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

গাড়ি থামতেই নীচে নামল নীলাঞ্জন। বাইরেটা খুব ঠান্ডা। গাড়ির কাচ বন্ধ থাকায় এতক্ষণ তা বুঝতে পারেনি নীলাঞ্জন। মাফলারটা দিয়ে কানের কাছটা ভাল করে ঢেকে নিল সে। শুভম আর ড্রাইভারও নীচে নামল। শুভম এসে দাঁড়াল নীলাঞ্জনের পাশে। জায়গাটার চার পাশ ভাল করে দেখতে লাগল নীলাঞ্জন। আশপাশে কেউ কোথাও নেই। জঙ্গলের দিক থেকে শুধু ঝিঁঝিঁপোকার একটানা শব্দ ভেসে আসছে। আর, মাঝে-মাঝে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা হাড় পর্যন্ত কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে মিনিটদশেক কেটে গেল, কিন্তু কৃষ্ণলামার দেখা নেই! নীলাঞ্জন ভাবল, লোকটা ভাঁওতা দেয়নি তো তাকে! আবার তার পরমুহূর্তেই তার মনে হল, তাকে ভাঁওতা দিয়ে কী লাভ কৃষ্ণলামার? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এসব কথা চিন্তা করতে লাগল নীলাঞ্জন। ড্রাইভার ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে এসে দাঁড়াল নীলাঞ্জনের সামনে। তারপর নীলাঞ্জনকে হিন্দিতে বলল, "আপনার লোক তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না! যার নিতে আসার কথা তার নাম কী?"

নীলাঞ্জন উত্তর দিল, "তাঁর নাম কৃষ্ণলামা।"

কথাটা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ড্রাইভার। তারপর নীলাঞ্জনকে বলল, "একটা কথা বলি, আপনি বরং ফিরে চলুন। এ জায়গাটা ভাল নয়। তা ছাড়া...।"

সে কথাটা শেষ না করায় নীলাঞ্জন বলল, "তা ছাড়া কী?"

লোকটা কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ নীলাঞ্জনের পিছন দিকে তাকিয়ে লোকটার মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে নীলাঞ্জন দেখল, যে জায়গাটা দিয়ে সুঁড়িপথ নেমে গিয়েছে জঙ্গলের ভিতর, ঠিক তার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণলামা। নীলাঞ্জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি এগিয়ে এলেন তার সামনে। তারপর ইংরাজিতে বললেন, "আমি দুঃখিত, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। আপনাদের জিনিসপত্র কোথায়?"

নীলাঞ্জন ড্রাইভারকে ইশারা করল ডিকি থেকে জিনিসপত্র নামানোর জন্য। ড্রাইভার যেন তার নির্দেশের প্রতীক্ষাতেই ছিল। সে দ্রুত গাড়ির ডিকি খুলে নীলাঞ্জনদের সুটকেস দু'টো নামিয়ে দিল। তারপর এক লাফে ড্রাইভারের সিটে বসে এমনভাবে গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল যে, নীলাঞ্জনের মনে হল, কৃষ্ণলামা উপস্থিত হওয়ার পর তার আর এখানে এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছে ছিল না। সে যেন পালিয়ে গেল। গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর কৃষ্ণলামা বললেন, "তা হলে এবার যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।"

কথাটা বলে তিনি মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলেন আর তার সঙ্গে-সঙ্গে সেই সুঁড়িপথ বেয়ে জঙ্গলের আড়াল থেকে উপরে উঠে এলেন খচ্চরের পিঠে বসা একজন লামা ও তাঁর পিছন-পিছন গোটা চারেক খচ্চর। তাঁরা এসে দাঁড়ালেন নীলাঞ্জনদের সামনে। কাছে আসার পর নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, লামাটি একজন বামন অবতার বিশেষ। আর তাঁকে জড়িয়ে খচ্চরের পিঠে বসে আছে একটা লালমুখো হৃষ্টপুষ্ট পাহাড়ি বাঁদর। শুভম আর নীলাঞ্জন দু'জনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই অদ্ভুতদর্শন লামা আর তাঁর পোষা প্রাণীটির দিকে। তাঁরা এসে নীলাঞ্জনদের কাছে দাঁড়ানোর পর কৃষ্ণলামা দুর্বোধ ভাষায় কী একটা বললেন বামনলামাকে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বাঁদরটাকে কাঁধে নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে নামলেন খচ্চরের পিঠ থেকে। তারপর নীলাঞ্জনদের সুটকেস দু'টো নিয়ে একটা খচ্চরের পিঠের দু' পাশে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। নীলাঞ্জন কৃষ্ণলামাকে প্রশ্ন করল, "আমাদেরও খচ্চরের পিঠে বসে যেতে হবে না কি?"

কৃষ্ণলামা বললেন, "হ্যাঁ, আমরা এবার যে পথে যাব, সেই পথে বাহন বলতে এই প্রাণীগুলোই। পায়ে হেঁটে হয়তো সেখানে যাওয়া যায়, কিন্তু আপনারা সেই পথে চড়াই-উতরাই ভেঙে হাঁটতে পারবেন না। তাই এই ব্যবস্থা।"

শুভমের কথাটা শুনে দারুণ লাগল। এর আগে সে একবার বাবার সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনের মাঠে ঘোড়ার পিঠে চেপেছে। গাধার চেয়ে একটু বড় আর ঘোড়ার চেয়ে ছোট এই প্রাণীগুলোর পিঠে সে কোনও দিন চাপেনি। ফিরে গিয়ে সে এবার তার বন্ধুদের এই আজব প্রাণীর পিঠে চাপার গল্প করতে পারবে। বামনলামা এবার দু'টো খচ্চরের গলার দড়ি ধরে এসে দাঁড়ালেন নীলাঞ্জনদের সামনে। কৃষ্ণলামা এবার নীলাঞ্জনকে বললেন, "উঠে পড়ুন, ভয়ের কিছু নেই। শুধু দড়িটা শক্ত করে ধরে থাকবেন।"

খচ্চরগুলোর পিঠে একটা করে কাপড়ের গদি ঝোলানো আছে। কৃষ্ণলামা প্রথমে শুভমকে মাটি থেকে দু' হাত দিয়ে তুলে বসিয়ে দিলেন একটা প্রাণীর পিঠে। নীলাঞ্জনও চড়ে বসল একটার পিঠে। তারা দু'জন চড়ে বসার পর কৃষ্ণলামা আর বামনলামাও চড়ে বসলেন দু'টো খচ্চরের পিঠে। নীলাঞ্জন দেখল কৃষ্ণলামা এত লম্বা যে, তাঁর পা মাটিতে ঠেকে যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে সুঁড়িপথ বেয়ে প্রথমে নামতে শুরু করলেন তাঁরা। প্রথমে চলেছেন কৃষ্ণলামা, তারপর শুভম, তারপর নীলাঞ্জন। নীলাঞ্জনের ঠিক পিছনেই ভারবাহী খচ্চরটা, আর সব শেষে সেই বামনলামা আর তাঁর বাঁদরটা। কখনও উঁচু, কখনও নিচু পথ বেয়ে এঁকেবেঁকে চলতে লাগলেন তাঁরা। পথ খুব সঙ্কীর্ণ, পথের এক পাশে খাদ, আর মাঝে-মাঝে ঘন বাঁশের জঙ্গল। আর, সারা পথ জুড়ে ঝিঁঝিঁপোকার অবিশ্রান্ত ডাক। পৃথিবীর সব ঝিঁঝিঁপোকা যেন আশ্রয় নিয়েছে পথের এই ঝোপঝাড়ে। শুভম মনের আনন্দে তার হাতের জপযন্ত্রটা ঘোরাতে-ঘোরাতে দু' পাশ দেখতে-দেখতে চলেছে। হঠাৎ শুভম বলে উঠল, "কাকু, ওই দ্যাখো!"

নীলাঞ্জন তাকিয়ে দেখল, খাদের ওপাশের পাহাড়টার গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে চলেছে একটা ঝরনা। সেটা এত সুন্দর যে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় তার দিকে। নীলাঞ্জন মনে-মনে ভাবল যে, এই পথে না এলে কোনও দিন দেখা হত না এই আশ্চর্য সুন্দর জিনিসটা। নীলাঞ্জনরা যাতে ঝরনাটা ভাল করে দেখতে পারে, তার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন কৃষ্ণলামা। সেখানে মিনিটতিনেক দাঁড়ানোর পর তিনি আবার চলতে শুরু করলেন। প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর হঠাৎ একটা গুমগুম শব্দ শুনতে পেল নীলাঞ্জনরা।

কৃষ্ণলামা এবার ঘাড় ঘুরিয়ে নীলাঞ্জনের উদ্দেশে বললেন, "আমরা গুম্ফার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি।"

একটু এগিয়েই নীলাঞ্জনরা একটা খাড়া পথ বেয়ে উপর দিকে উঠতে শুরু করল। সেই পথ বেয়ে বেশ অনেকটা উপরে উঠে এক সময় তাঁরা পৌঁছে গেলেন তিন দিক খোলা একটা বিরাট চত্বরে। তার এক দিকে পাহাড়ের ঢালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্যাগোডা ধাঁচের বিরাট এক দ্বিতল গুম্ফা। গুম্ফার দু' পাশে খাদের ধার ঘেঁষে সার-সার কাঠের ঘর। আর সেগুলোর মাথার উপর লম্বা-লম্বা বাঁশের মাথায় উড়ছে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া লুংদার। কাঠের ঘরগুলোর সামনে বসে ছিলেন একদল নানাবয়সি লামা।

নীলাঞ্জনরা মনাস্ট্রির সামনের চত্বরে উপস্থিত হতেই তাঁরা যে যেখানে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন কৃষ্ণলামার উদ্দেশে। তাঁদের দিকে তাকিয়ে একবার মাথা ঝুঁকিয়ে নীলাঞ্জনদের নিয়ে কৃষ্ণলামা আর-একটু এগিয়ে গিয়ে থামলেন একেবারে গুম্ফার প্রবেশদ্বারের সামনে। প্রথমে কৃষ্ণলামা নামলেন খচ্চরের পিঠ থেকে। তারপর একে-একে নামল শুভম আর নীলাঞ্জন। নীলাঞ্জন একবার ভাল করে তাকাল মনাস্ট্রির দিকে। মনাস্ট্রিটা যে অনেক দিন আগে তৈরি হয়েছিল, তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না নীলাঞ্জনের। তার দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলো সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। প্রবেশদ্বারের মাথার উপর লাগানো অপদেবতাদের ভয়ংকর মুখগুলো ভেঙে ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। চার দিকে কেমন যেন একটা গা ছমছমে পরিবেশ।

কৃষ্ণলামা এবার নীলাঞ্জনের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর

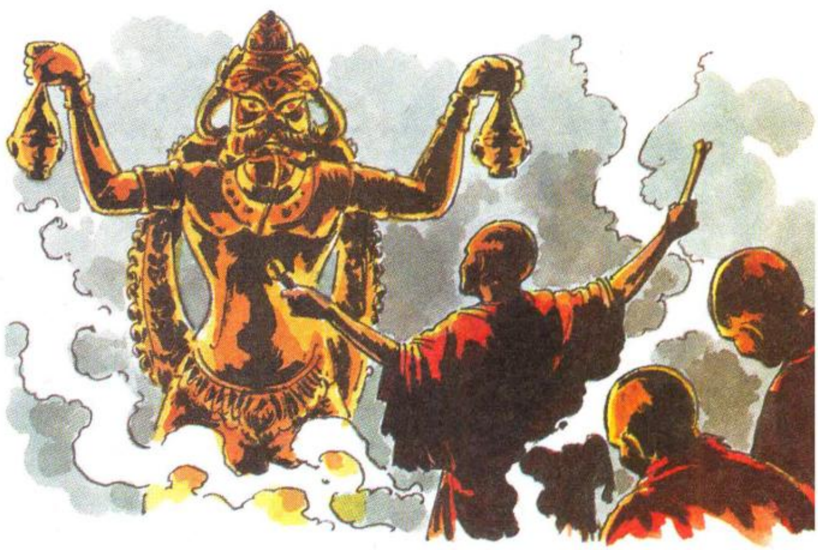

মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "কৃষ্ণলামা তার গুম্ফায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে।" তারপর তাঁর পিছন-পিছন আসার জন্য ইশারা করলেন। গুম্ফাটাকে বেড় দিয়ে তিনি নীলাঞ্জনদের নিয়ে উপস্থিত হলেন গুম্ফার ঠিক পিছনের লাগোয়া একটা ঘরের সামনে। ঘরের দরজাটা ভেজানোই ছিল, কৃষ্ণলামার সঙ্গে নীলাঞ্জনরা ঘরের ভিতরে ঢুকল। ঘরটা বেশ বড়। মেঝে আর দেওয়ালগুলো কাঠের। ঘরের ঠিক পিছন দিকে নেমে গিয়েছে অতল খাদ, আর তার ঢালে পাইন গাছের জঙ্গল। ঘরের এদিকটায় একটা জানলা আছে, তবে তার কোনও গরাদ নেই। হয়তো খাদের দিক থেকে কেউ ঘরে ঢুকতে পারবে না, তাই গরাদের কোনও প্রয়োজন নেই। ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে শাল কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বিশাল একটা খাট, তার উপর সুন্দর বিছানা পাতা।

কৃষ্ণলামা বললেন, "আপাতত আপনারা এখানে একটু বিশ্রাম নিন। একটু পরে আমি আপনাদের প্রার্থনাকক্ষের ভিতরে নিয়ে যাব।"

নীলাঞ্জন বলল, "আচ্ছা।"

কৃষ্ণলামা এবার দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। নীলাঞ্জন দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খাটের উপর সটান শুয়ে পড়ল, আর শুভম জপযন্ত্রটা হাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল খোলা জানলার সামনে। তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মিনিটপাঁচেক পর দরজায় ঠকঠক শব্দ হতেই নীলাঞ্জন আবার উঠে বসল খাটের উপর। তারপর দরজাটা ফাঁক হয়ে গেল। দু'জন লামা ঢুকলেন ঘরের ভিতর। তাঁদের এক জনের হাতে নীলাঞ্জনদের সুটকেস দু'টো, আর-এক জনের হাতে বিরাট একটা বারকোশের উপর রাখা বড়-বড় চারটে কাঠের বাটি, তার মধ্যে থেকে ধোঁয়া উঠছে। সুটকেস দু'টো ঘরের কোনায় আর বারকোশটা খাটের উপর রেখে লামা দু'জন আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। নীলাঞ্জন দেখল, বারকোশের উপর দু'টো বাটিতে রাখা আছে জল। আর দু'টোয় রাখা আছে সুজির মণ্ড। কত কী খাবার। বারকোশের উপর দু'টো চামচও রাখা ছিল। তা দিয়ে সেই গরম মণ্ডটা মুখে দিয়ে নীলাঞ্জন দেখল,

স্বাদটা অনেকটা মাখনের মতো। শুভমও এসে খাবারটা মুখে দিয়ে দেখল, খেতে মন্দ লাগল না। নীলাঞ্জন আর শুভম দু'জনেই খাবারটা খেয়ে শেষ করল। শুভম জিজ্ঞেস করল, "কাকু, এই খাবারটার নাম কী?"

নীলাঞ্জন বলল, "সম্ভবত এই খাবারটাকে তিব্বতিরা বলে 'চম্বা'। গম, যব ইত্যাদি পিষে তার সঙ্গে মাখন মিশিয়ে এই খাবার তৈরি করা হয়। ঠান্ডার দেশে এই চম্বা শরীর গরম রাখে।"

শুভম কথাটা মনে রাখার জন্য দু'বার মনে-মনে বলল, চম্বা...চম্বা...। খাওয়া শেষ হওয়ার একটু পরেই নীলাঞ্জনদের ঘরে উপস্থিত হলেন কৃষ্ণলামা। নীলাঞ্জন শুভমকে বলল, "চলো শুভম, প্রার্থনাকক্ষটা দেখে আসি।"

শুভম বলল, "তুমি যাও নীলাঞ্জনকাকু, আমার পা ব্যথা করছে। আমি এখানে শুয়ে থাকি।"

নীলাঞ্জন তাকাল শুভমের দিকে। নীলাঞ্জন আর শুভমের কথা বুঝতে না পারলেও মনে হয়, ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন কৃষ্ণলামা। তিনি নীলাঞ্জনকে বললেন, "ও মনে হয় যেতে চাইছে না, তাই না? ও যদি যেতে না চায়, তা হলে ভয়ের কোনও কারণ নেই। ওকে আপনি নিশ্চিন্তে এখানে রেখে যেতে পারেন। এই ঘরে কেউ আসবে না।"

কৃষ্ণলামার কথা শুনে নীলাঞ্জন শুভমের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে, তা হলে তুমি বিছানায় শুয়ে থাকো। আমি একটু পরেই আসছি।"

নীলাঞ্জন দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কৃষ্ণলামার সঙ্গে প্রার্থনাকক্ষ দেখতে চলল।

॥ ৫ ॥

নীলাঞ্জনরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর জুতো খুলে বেশ কিছুক্ষণ খাটের উপর শুয়ে রইল শুভম। হঠাৎ কাঠের মেঝেয় ঠক করে একটা শব্দ হল। শুভম উঠে বসল খাটের উপর। সে দেখল, মেঝেয় একটা খুব ছোট পাথরের টুকরো পড়ে আছে। কিন্তু সেটা এল কোথা থেকে! নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে। এই ভেবে সে জানলাটার দিকে তাকাল। ঠিক সেই মুহূর্তেই জানলা দিয়ে আর-একটা পাথরের টুকরো এসে পড়ল ঘরের ভিতর। শুভম খাট থেকে নেমে ধীরে-ধীরে এসে দাঁড়াল জানলার সামনে। বাইরে তখন সন্ধে নেমে আসছে। আস্তে-আস্তে অন্ধকার নেমে আসছে খাদের ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া পাইনের জঙ্গলে। শুভম জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। প্রথমে সে কিছুই দেখতে পেল না।

তারপর যেন নীচ থেকে হাততালি দেওয়ার একটা মৃদু শব্দ সে শুনতে পেল। শুভম তার শরীরটাকে জানলার বাইরে আর-একটু বের করে দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। এবার সে দেখতে পেল তাকে। শুভম যে ঘরে আছে, ঠিক তার গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে জঙ্গলে ঢাকা খাদ। শুভমদের ঘর থেকে হাত পঁচিশেক নীচে খাদের গা থেকে একটা পাথর ঝুলন্ত টেবিলের মতো বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। তার উপর দাঁড়িয়ে ছোট্ট একজন লামা তাকিয়ে আছে শুভমের দিকে।

শুভমের সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই সে হাত নেড়ে ইশারায় কী বলতে শুরু করল, আর মাঝে-মাঝে একটা হাত মাথার উপর ঘোরাতে লাগল। শুভম বোঝার চেষ্টা করতে লাগল, তার বয়সি এই ছোট্ট লামাটি কী বলার চেষ্টা করছে! তার মনে হতে লাগল, সে যেন শুভমের কাছে কিছু চাইছে। আর এর পর হঠাৎই শুভম চিনে ফেলল তাকে। আরে, এ তো সেই ছেলেটি! এই ছেলেটিকে আর বৃদ্ধ লামাটিকে শুভমরা পৌঁছে দিয়েছিল হাসপাতালে! আর তার জপযন্ত্রটা রয়েছে শুভমের কাছে! মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল শুভমের কাছে। মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সে জপযন্ত্রটার কথাই বোঝানোর চেষ্টা করছে শুভমকে। সে সেটা ফেরত চাইছে শুভমের কাছ থেকে। খাটের উপর পড়ে ছিল জপযন্ত্রটা। জানলা ছেড়ে শুভম এগিয়ে গেল খাটের উপর থেকে জপযন্ত্রটা নেওয়ার জন্য। খাট থেকে জপযন্ত্রটা হাতে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন কৃষ্ণলামা আর নীলাঞ্জন।

শুভম একটু থতমত খেয়ে তাঁদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল খাটের পাশে। কী করবে বুঝতে না পেরে একবার জানলার দিকে তাকাল, আর-একবার তাকাল কৃষ্ণলামার দিকে। ভাবল, ব্যাপারটা সে এখনই বলে দেবে কি না নীলাঞ্জনকাকুকে। কারণ, নীলাঞ্জনকাকু বলেছে, সেই ছেলেটি আর বৃদ্ধটির সঙ্গে দেখা হলে জপযন্ত্রটা ফেরত দিয়ে দেবে তাঁদের। কিন্তু ঘরের মধ্যে কৃষ্ণলামার উপস্থিতির জন্য ছেলেটির কথাটা সে বলতে গিয়েও বলতে পারল না নীলাঞ্জনকে। শুভমকে জপযন্ত্রটা হাতে নিয়ে খাটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নীলাঞ্জন বলল, "কী, একলা ঘরে থাকতে ভয় করছিল না কি? এভাবে দাঁড়িয়ে আছ?"

শুভম ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, "না।"

কৃষ্ণলামাও তাকিয়ে ছিলেন শুভমের দিকে, হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল মেঝের উপর পড়ে থাকা পাথরের টুকরো দু'টোর উপর। কৃষ্ণলামা মেঝের উপর ঝুঁকে কুড়িয়ে নিলেন সে দু'টো। শুভম দেখল, তাঁর ভুরু দু'টো যেন হঠাৎ কুঁচকে গেল। পাথর দু'টো কুড়িয়ে নিয়ে কৃষ্ণলামা গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার কাছে, তারপর ভাল করে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। শুভমের মনে হল, কৃষ্ণলামা কিছু একটা সন্দেহ করেছেন। নীলাঞ্জন বসে পড়ল খাটের উপর, আর শুভম তাকিয়ে রইল কৃষ্ণলামার দিকে। এই সময় ঘরে ঢুকল বামনাকৃতি সেই লামাটি। তাঁর হাতে বিরাট একটা জ্বলন্ত প্রদীপ। লামাটি ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অন্য রকম গন্ধে ভরে গেল ঘরটা।

শুভমের মনে পড়ল ফুদুং মনাস্ট্রির প্রার্থনাকক্ষের ভিতরেও এই গন্ধটা ছিল। সেখানেও এই রকম অনেক প্রদীপ জ্বলছিল। নীলাঞ্জনকাকু শুভমকে বলেছে যে, এই প্রদীপগুলোয় ঘিয়ের বদলে চর্বি ব্যবহার করা হয় বলে এরকম গন্ধ বের হয়। বামনলামা ঘরের এক কোনায় প্রদীপটা নামিয়ে রেখে যাওয়ার পর কৃষ্ণলামা জানলাটা আস্তে-আস্তে বন্ধ করে দিলেন। তারপর নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠান্ডা পড়তে শুরু করবে এবার, তাই জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। এখন আমি যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে। ঠিক সময়ে আমার লোক এসে আপনাদের ডেকে নিয়ে যাবে।" এই বলে কৃষ্ণলামা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণলামা যাওয়ার পর শুভম প্রথমে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তারপর জানলার কাছে গিয়ে সেটা খুলে ফেলল। পাহাড়ের বুকে ঝপ করে সন্ধে নামে। শুভম জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার গ্রাস করে নিয়েছে সেই জায়গাটা। জানলা বন্ধ করে দিয়ে খাটের উপর নীলাঞ্জনের পাশে গিয়ে বসে পড়ল শুভম। খাটের এক পাশে একটা বিরাট পালকের তৈরি লেপ ভাঁজ করে রাখা ছিল। নীলাঞ্জন ততক্ষণে সেই লেপটা খুলে নিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। শুভমও ঢুকে পড়ল তার ভিতর। তারপর বলল, "জানো নীলাঞ্জনকাকু, সেই ছেলেটি না এসেছিল!"

নীলাঞ্জন শুভমের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, "কোন ছেলেটি?"

শুভম জবাব দিল, "যে ছেলেটি সেদিন সেই বৃদ্ধ লামাটির সঙ্গে ছিল, যাঁদের জপযন্ত্রটা আমাদের কাছে আছে!"

শুভমের কথা শুনে নীলাঞ্জন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায়? কখন?"

শুভম এবার সব খুলে বলল নীলাঞ্জনকে। নীলাঞ্জন সব শুনে বলল, "যাক, ভালই হল। লামা আর ছেলেটি নিশ্চয়ই এখানেই থাকেন। জপযন্ত্রটা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে তাঁদের। হয়তো তাঁরাও ওই জপযন্ত্রটার জন্য আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এখান থেকে গ্যাংটক ফিরে তোমাকে আমি আর-একটা জপযন্ত্র কিনে দেব।"

এর পর নীলাঞ্জন আর কিছু বলল না। শুভম লেপটা নিজের মাথা পর্যন্ত টেনে দিল। লেপটা হাল্কা হলেও খুব গরম। লেপের ভিতর খুব আরাম লাগল শুভমের। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুভম ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত আটটা নাগাদ দরজায় শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল নীলাঞ্জনের। ঘরের ভিতর প্রায় অন্ধকার বললেই চলে। চর্বির প্রদীপটার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। শুধু একটা ক্ষীণ শিখা তিরতির করে কাঁপতে-কাঁপতে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। নীলাঞ্জন দরজা খুলে দেখল, বামনলামা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ইশারায় নীলাঞ্জনকে জানালেন, কৃষ্ণলামা তাদের ডাকছেন। নীলাঞ্জন এবার ডেকে তুলল শুভমকে। তারপর মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই জুতো পরে, কানে ভাল করে মাফলার জড়িয়ে নীলাঞ্জন আর শুভম ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে, একদম হাড় পর্যন্ত কনকন করছে। বামনলামার পিছন-পিছন শুভম আর নীলাঞ্জন এসে ঢুকল গুম্ফার ভিতর। তাঁর বিশাল প্রার্থনাকক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রদীপ জ্বলছে। তার আভা ছড়িয়ে পড়েছে প্রার্থনাকক্ষের স্তম্ভগুলোর গায়ে খোদাই করা ভয়ংকর মূর্তিগুলোর উপর। আলোছায়ায় একটা থমথমে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে গুম্ফার মধ্যে। নীলাঞ্জন আর শুভম প্রার্থনাকক্ষের সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল মাত্র, তারপর বামনলামার সঙ্গে ঢুকল প্রার্থনাকক্ষের লাগোয়া একটা ঘরের মধ্যে। ঘরটা একেবারে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ঘরের ভিতর ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল শুভম আর নীলাঞ্জন। একটা মৃদু শব্দ শুনতে পেল নীলাঞ্জন, তার পরই একটা হাল্কা আলোয় ভরে উঠল ঘরটা। দু'জনে দেখল বামনলামা একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে ফেলেছেন। প্রদীপটা হাতে নিয়ে বামনলামা সেই ঘর পেরিয়ে ঢুকলেন আর-একটা ঘরের মধ্যে। নীলাঞ্জনরা সেখানে ঢুকে দেখল, সেই ঘরের এক পাশে একটা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে উপরের দিকে। বামনলামার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নীলাঞ্জনরা উঠে এল দোতলায়। নীলাঞ্জনের চোখে পড়ল একটা অন্ধকার করিডোর চলে গিয়েছে সামনের দিকে। আর তার শেষ প্রান্তে একটা ঘরের ভিতর থেকে উজ্জ্বল আলো দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার পর বামনলামা কিন্তু আর এগোলেন না। তিনি ইশারায় সেই ঘরটার দিকে নীলাঞ্জনদের যেতে বললেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন।

শুভমকে নিয়ে নীলাঞ্জন গিয়ে দাঁড়াল ঘরটার সামনে। দরজায় একটা পরদা ঝুলছিল, সেটা এবার সরে গেল। কৃষ্ণলামা ঘরের ভিতর ঢোকার জন্য নীলাঞ্জনদের আমন্ত্রণ জানালেন। ঘরের ভিতর জ্বলছে একটা পেট্রোম্যাক্স, তার আলো ছড়িয়ে আছে পুরো ঘর জুড়ে। ঘরের ভিতর ঢুকেই চমকে গেল নীলাঞ্জন। তার মনে হল, সে যেন একটা কিউরিও শপের ভিতরে ঢুকল! বিরাট ঘরটার দেওয়াল আর মেঝের কার্পেটের উপর সাজিয়ে রাখা আছে নানা ধরনের আশ্চর্য সব জিনিস। কাঠের তৈরি ভয়ংকর সব মুখোশ, নানা ধরনের ছোট-বড় পাথরের মূর্তি, জপযন্ত্র, দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা রেশমের উপর সূক্ষ্ম কাজ করা প্রাচীন থাংকা, বাদ্যযন্ত্র, কী নেই সেই ঘরটার মধ্যে! নীলাঞ্জন আপন মনেই বলে উঠল, "ওয়ান্ডারফুল!"

কথাটা মনে হয় কানে গিয়েছিল কৃষ্ণলামার। তিনি বললেন, "ঘরের ভিতর যেসব জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তা দুর্মূল্য হলেও দুঃষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু আমি আপনাদের এর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান জিনিস দেখাব, যা দেখার সৌভাগ্য খুব কম মানুষের জীবনেই ঘটে।"

নীলাঞ্জন তাঁর কথা শুনে বলল, "হ্যাঁ, সেসব আপনি দেখাবেন, সেই আশাতেই তো আমাদের এখানে আসা।"

কৃষ্ণলামা মৃদু হাসলেন নীলাঞ্জনের কথা শুনে। তারপর ঘরের এক কোণে আঙুল তুলে দেখালেন। সেখানে একটা টেবিল ঘিরে গোটাচারেক চেয়ার রাখা আছে। তার মধ্যে একটা যে কৃষ্ণলামার নিজের জন্য, তা সেই চেয়ারটা অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা দেখেই শুভম বুঝতে পারল। সেটা ছেড়ে পাশাপাশি অন্য দু'টো চেয়ারে গিয়ে বসল নীলাঞ্জন ও শুভম। নীলাঞ্জনরা যেখানে গিয়ে বসেছে, তার চেয়ে একটু দূরে, দেওয়ালের গা ঘেঁষে রাখা আছে বিরাট একটা কাঠের সিন্দুক। সিন্দুকটা লম্বা-লম্বা লোহার পাত দিয়ে মোড়া, আর তার গায়ে একটা ভারী তালা ঝুলছে।

কৃষ্ণলামা তাঁর কোমর থেকে একটা চাবি বের করে সেই তালাটা খুলে ফেললেন। তারপর তার মধ্যে ঝুঁকে পড়ে বেশ বড় একটা কাপড়ের পোঁটলা বের করে এনে টেবিলের উপর রাখলেন। সেটা টেবিলের উপর রাখার পর কৃষ্ণলামা নীলাঞ্জনদের মুখোমুখি নিজের আসনে গিয়ে বসে পোঁটলাটা খুলতে লাগলেন। তা থেকে বেরিয়ে এল রেশমের কাপড় জড়ানো বেশ কয়েকটা জিনিস। তার মধ্যে একটা টেবিলের এক পাশে সরিয়ে রেখে অন্যগুলোর আবরণ খুলে ফেললেন লামা। বের হল চারটে বাটির মতো পাত্র। সেগুলো যে সোনার, তা দেখেই বুঝতে পারল নীলাঞ্জন। প্রত্যেকটার গায়ে নানারকমের নকশা কাটা, আর ছোট-ছোট রঙিন পাথর বসানো। নীলাঞ্জন একটা পাত্র টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। কৃষ্ণলামা আবার প্রশ্ন করলেন, "জিনিসগুলো ঠিক কত পুরনো, সে সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?"

নীলাঞ্জন জবাব দিল, "যদিও এই জিনিস আমি আগে দেখিনি, তবে জিনিসগুলো যে অন্তত চার-পাঁচশো বছরের পুরনো, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

নীলাঞ্জনের কথা শুনে কৃষ্ণলামা আর-একটা প্রশ্ন করলেন তাকে, "আপনি কি বলতে পারবেন সম্রাট কালাশোকের রাজত্বকাল বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কেন?"

নীলাঞ্জন জবাব দিল, "কারণ, তাঁর আমলেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় মহাধর্ম সম্মেলন বা বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈশালী নগরে। সময়টা ৩৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।"

নীলাঞ্জনের কথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৃষ্ণলামার চোখ। নীলাঞ্জন যে তাঁর প্রশ্নের এত ভাল উত্তর দেবে, তা হয়তো ধারণা ছিল না লামার। এর পর কয়েক মুহূর্ত নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কৃষ্ণলামা। তারপর এমন একটা কথা বললেন যে, চমকে গেল নীলাঞ্জন।

তিনি বললেন, "আপনি এতটা যখন জানেন, তখন এও নিশ্চয়ই জানেন যে, ওই মহাধর্ম সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেছিলেন ধর্মগুরু সভাকামী। আপনার সামনে যে পাত্রগুলো রাখা আছে, তা ওই সম্মেলনের সময় সম্রাট কালাশোক তুলে দিয়েছিলেন সভাকামীর হাতে।"

অন্য কোথাও অন্য কেউ একথা বললে হাসতে শুরু করত নীলাঞ্জন। কিন্তু কৃষ্ণলামার কণ্ঠস্বর শুনে সে বুঝতে পারল, তিনি যা বললেন তা দৃঢ়ভাবেই বললেন। নীলাঞ্জন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পাত্রগুলোর দিকে। কৃষ্ণলামার কথা সত্যি বলে ধরে নিলে এগুলোর বয়স প্রায় চব্বিশশো বছর! পাত্রগুলোর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মুখ তুলে সে তাকাল লামার দিকে।

লামা বললেন, "এবার আরও একটা জিনিস দেখাই আপনাকে।" বলে তিনি টেবিলের এক পাশে কাপড় জড়িয়ে রাখা জিনিসটা খুলে ফেললেন। আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা জপযন্ত্র, সেটা হুবহু দেখতে শুভমের কাছে থাকা জপযন্ত্রটার মতো!

জিনিসটা বের করার পর কৃষ্ণলামা বললেন, "এই জিনিসটা টেবিলের অন্য জিনিসগুলোর মতো এত পুরনো নয় ঠিকই, কিন্তু এটা আমার কাছে টেবিলে রাখা ওই পাত্রগুলোর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। কারণ, এটা আমার তান্ত্রিক গুরু মিনড্রোল, তারলিং-এর মন্ত্রপূত জপযন্ত্রের একটা। আর-একটা এখন রয়েছে আপনাদের কাছে।"

নীলাঞ্জন বিস্ময়ে বলে উঠল, "মানে?"

কৃষ্ণলামা বললেন, "মানে, আপনাদের কাছে যে জপযন্ত্রটা রয়েছে, সেটা এরই জোড়া। আর, সেটাই আমার চাই।"

নীলাঞ্জন লামাটির কথা শুনে উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে লামাটি বললেন, "আপনি কী বলবেন, তা আমি জানি। আপনি বলবেন যে, জিনিসটা আপনার নয়। আপনার হাতে জিনিসটা কীভাবে এসেছে, সে সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে। তবে একটা কথা বলি, আপনি যদি আমাকে জপযন্ত্রটা দিয়ে দেন, তা হলে পরে সেটা অন্য কেউ আপনার থেকে দাবি করবে না, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি।"

এ কথা বলার পর কৃষ্ণলামা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নীলাঞ্জনের দিকে। নীলাঞ্জন এবার কৃষ্ণলামাকে প্রশ্ন করল, "আপনি কেন বলছেন যে, কেউ আর আমাদের কাছে সেটা ফেরত চাইতে আসবে না?"

কৃষ্ণলামা নীলাঞ্জনের কথা শুনে শীতল কণ্ঠে বললেন, "আসবে না, কারণ, কালকের পর তা আর সম্ভব নয়।"

নীলাঞ্জন কৃষ্ণলামার কথা না বুঝতে পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। কৃষ্ণলামা বললেন, "বেশ রাত হয়েছে, আপনারা এবার উঠে পড়ুন। ঘরে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ুন। সারাদিন আপনাদের উপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে।"

লামার কথা শেষ হওয়ার পর নীলাঞ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তার দেখাদেখি শুভমও উঠে দাঁড়াল। কৃষ্ণলামা তাঁর জিনিসগুলোর উপর আবার কাপড় জড়াতে-জড়াতে বললেন, "আমার অনুরোধটা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখবেন। আশা করি কাল জপযন্ত্রটা আমার হাতে তুলে দেবেন!"

নীলাঞ্জনের মনে হল, কৃষ্ণলামা যেন অনেকটা আদেশের সুরেই এই কথাগুলো বললেন। নীলাঞ্জন কিছু উত্তর না দিয়ে শুভমকে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। ঘরের বাইরে এসে নীলাঞ্জনরা দেখল, অন্ধকার করিডোরের শেষ মাথায় সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার মুখটায় প্রদীপ হাতে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন বামনলামা। তাঁর পিছন-পিছন নীলাঞ্জন আর শুভম ফিরে চলল ঘরের দিকে। নীলাঞ্জনের মনে শুধু ঘুরতে লাগল কৃষ্ণলামার কথাগুলো। তার মনে হতে লাগল, এভাবে অপরিচিত জায়গায় শুভমকে নিয়ে চলে আসা কখনওই ঠিক হয়নি।

নীলাঞ্জনরা ঘরে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর দু'জন লামা এসে তাদের খাওয়ার জন্য এক ধরনের মিষ্টি রুটি আর দুধ দিয়ে গেলেন। একটু পরে আর-একজন এসে একটা প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেলেন। খাওয়ার পর শুভমকে পাশে নিয়ে শুয়ে কৃষ্ণলামার কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল নীলাঞ্জন।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল শুভমের। তার মনে হল, কেউ যেন এসে দাঁড়িয়েছে খাটের পাশে। আস্তে-আস্তে লেপের বাইরে মাথা বের করল শুভম। সারা ঘর প্রায় অন্ধকার। তারা শোওয়ার আগে একজন এসে একটা প্রদীপ রেখে গিয়েছিল। সেটা প্রায় নিভে এসেছে। শুধু তার একটা ম্লান আভা ছড়িয়ে আছে ঘরে। শুভম প্রথমে সেই অন্ধকার ঘরে কিছু দেখতে পেল না। তারপর আস্তে-আস্তে তার চোখের সামনে স্পষ্ট হতে লাগল খাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ছোট্ট মানুষের অবয়ব। শুভমের মনে হল, লোকটা নিশ্চয়ই বামনলামা। ভয় পেয়ে গেল শুভম। সে পাশে শুয়ে থাকা নীলাঞ্জনকাকুকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে যাবে, ঠিক সেই সময় প্রদীপের আলোটা হঠাৎ দপদপ করতে লাগল। আর সেই আলোয় শুভম দেখতে পেল, ঘরের ভিতর যে এসে দাঁড়িয়েছে সে বামনলামা নয়, সে হল সেই ছোট লামাটি, যার জপযন্ত্রটা রয়েছে তার কাছে।

কেন যেন শুভমের ভয়টা আস্তে-আস্তে কেটে যেতে লাগল। নীলাঞ্জনকে সে আর ডাকল না। ধীরে-ধীরে খাটের উপর উঠে

বসে শুভম তাকিয়ে রইল তার দিকে। কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর শুভম বুঝতে পারল, সে যেন ইশারায় তাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে কী বলতে চাইছে, বুঝতে পারছিল না শুভম। হঠাৎ সে একটা হাত বাড়িয়ে দিল শুভমের দিকে, আর সঙ্গে-সঙ্গেই সে কী বলতে চাইছে তা স্পষ্ট হয়ে গেল শুভমের কাছে। শুভম হাতড়ে-হাতড়ে লেপের ভিতর থেকে জপযন্ত্রটা বের করে আনল। তারপর সেটা বাড়িয়ে দিল ছেলেটির দিকে। ছেলেটি নিয়ে নিল সেটা। পরমুহূর্তেই প্রদীপটা নিভে গিয়ে সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। শুভম আর কিছু দেখতে পেল না। বেশ কিছুক্ষণ একইভাবে খাটের উপর বসে রইল শুভম। তারপর আবার তার চোখে ঘুম নেমে এল। লেপের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

॥ ৬ ॥

ভোরবেলা ঢাকের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নীলাঞ্জনের। বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িটা নিয়ে সে দেখল, সকাল সাতটা বেজে গিয়েছে। শুভমের ঘুম এখনও ভাঙেনি। লেপটা গায়ে জড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসল সে। জানলার পাল্লা দু'টোর ফাঁক দিয়ে একচিলতে আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতর। মিনিটপাঁচেক খাটের উপর বসে থাকার পর নীচে নেমে জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেজানো পাল্লা দু'টো খুলে ফেলল নীলাঞ্জন। সঙ্গে-সঙ্গে আলোয় ভরে গেল সারা ঘর। নীলাঞ্জন বাইরের দিকে তাকাল খোলা জানলা দিয়ে।

কী অপূর্ব লাগছে চার দিক! সকালের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে খাদের ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া সবুজ জঙ্গলে। দূরে, আকাশের বুকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুষারাবৃত পর্বতমালা। তাদের শিখরগুলো যেন ক্রিস্টালের মতো জ্বলছে। হঠাৎ নীলাঞ্জনের চোখ পড়ল জানলার হাত দুই নীচে, বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা একটা কাঠের টুকরোর দিকে। তার গা থেকে নীচের দিকে লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। দড়িটা গিয়ে শেষ হয়েছে হাত পঁচিশেক নীচে, খাদের গায়ে ঝুলন্ত একটা পাথরের চাতালের উপর। দড়িটা এখানে এমনভাবে ঝোলানো রয়েছে কেন, ভাবতে লাগল সে। নিচ থেকে যদি এই পাথরের চাতাল পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে, তা হলে এই দড়ি বেয়ে অনায়াসেই জানলার কাছে পৌঁছতে পারে।

নীলাঞ্জন এবার দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনল। সে জানলা ছেড়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তিন জন লামা। তাঁদের মধ্যে দু'জনের হাতে কাঠের বারকোশের উপর কাপড় ঢাকা দেওয়া বেশ কয়েকটা পাত্র। আর-একজনের হাতে একটা বিরাট কেটলি। তার মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। নীলাঞ্জন দরজার পাশ থেকে সরে দাঁড়াল। তাঁরা ভিতরে ঢুকে জিনিসগুলোকে নীচে নামিয়ে রাখলেন। তারপর তাঁদের একজন নীলাঞ্জনকে ঘরের বাইরে আসতে ইশারা করলেন। নীলাঞ্জন বাইরে আসতে তিনি নীলাঞ্জনদের ঘরের পাশে কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি ঢালু ছাদওলা একটা ছোট ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। নীলাঞ্জন সেই ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে বুঝতে পারল, সেটা আসলে বাথরুম।

লামারা চলে যাওয়ার পর ঘরে ফিরে এসে নীলাঞ্জন দেখল, শুভমের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বাইরে ঢাকের শব্দ শুনে শুভম বলল, "বাইরে কীসের শব্দ শোনা যাচ্ছে?"

নীলাঞ্জন বলল, "ওটা ঢাকের শব্দ। আজ এখানে ছাম উৎসব তো, তাই মনে হয় ঢাক বাজানো হচ্ছে।"

কেটলিতে রাখা গরম জল দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল নীলাঞ্জন আর শুভম। তারপর খাবার খেয়ে নিল। খাবার বলতে অনেকটা মিষ্টি সুজির মতো একটা জিনিস, আর চায়ের মতো একটি পানীয়। তার মধ্যে আবার একদলা মাখন ফেলা। স্বাদটা কিছুটা নোনতা হলেও সেটা খেতে মন্দ লাগল না শুভমের। খাওয়া শেষ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। মনাস্ট্রিকে বেড় দিয়ে সামনে আসতেই তারা চমকে গেল। সেখানে নানাবয়সি লামার ভিড়। একপাশে রাখা আছে বিরাট একটা ঢাক। একজন বৃদ্ধ লামা বাজিয়ে চলেছেন ঢাকটা। তার শব্দ পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে আবার। নীলাঞ্জন দেখল, ঢাকটা যা দিয়ে বাজানো হচ্ছে, সেটা সম্ভবত মানুষের উরুর হাড়। নীলাঞ্জনদের দেখে সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণলামা। তারপর বললেন, "আশা করি রাতে আপনাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। আর কিছুক্ষণ পরেই উৎসব শুরু হবে। এই উৎসবে আজ আপনারা আমাদের অতিথি।"

লামার কথা শেষ হলে নীলাঞ্জন বলল, "কাল যখন এলাম তখন এত লোক দেখিনি তো! এঁরা কী সকলে এখানেই থাকেন?"

কৃষ্ণলামা বললেন, "না, এত লোক এখানে থাকে না। এই পাহাড়ি জঙ্গলে অনেক ছোট-ছোট গুম্ফা আছে, যার খোঁজ বাইরের কেউ রাখে না। কাল সারা রাত ধরে ওরা সেই সব জায়গা থেকে এখানে এসে জড়ো হয়েছে। আজ উৎসব শেষ হলেই সকলে যে যার জায়গায় ফিরে যাবে।"

এর পর নীলাঞ্জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণলামা গুম্ফার ভিতর চলে গেলেন। নীলাঞ্জন আর শুভম ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল চার দিক।

আধ ঘণ্টা সময় কেটে গেল। ভিড়ও কিছুটা বাড়ল। শেষে এক সময় ঢাকটা দ্রুত বাজতে শুরু করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে সকলে মনাস্ট্রির সামনের চত্বরের চার দিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনাস্ট্রির ভিতর থেকে ছ'জন লোক কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলেন অন্তত পঁচিশ ফুট লম্বা একটা বিশাল সানাই। আর তাঁদের পিছন-পিছন বেরিয়ে এলেন ভয়ংকর মুখোশপরা জনা কুড়ি লোক। গায়ে তাঁদের রংচঙে পোশাক, কোমরে তরবারি। আর সকলের পিছনে বের হলেন ঝলমলে পোশাক ও শিরস্ত্রাণের মতো উজ্জ্বল হলুদ রঙের টুপি পরা কৃষ্ণলামা। তিনি বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত লামারা মাথা ঝুঁকিয়ে দুর্বোধ ভাষায় চিৎকার করে উঠলেন।

কৃষ্ণলামা এসে দাঁড়ালেন বৃত্তের ঠিক মাঝখানে। বামনলামা এগিয়ে এসে কৃষ্ণলামার হাতে জলভরা একটা পাত্র তুলে দিলেন। কৃষ্ণলামা পাত্র থেকে চার দিকে জল ছেটাতে-ছেটাতে তিব্বতি ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হওয়ার পর আবার সকলে মাথা ঝুঁকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। কৃষ্ণলামা এবার কয়েক পা পিছু হটে কী একটা ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিরাট সানাইটা তিনবার বেজে উঠল। শুরু হল ছাম উৎসব। দ্রুত ঢাকের বাজনার সঙ্গে-সঙ্গে কোমরের তরবারি

খুলে নিয়ে নৃত্যযুদ্ধ শুরু করলেন ভয়ংকর মুখোশপরা লামারা। শুভম অবাক চোখে সব কিছু দেখতে লাগল। নীলাঞ্জনও কম অবাক হয়নি। সে ক্যামেরা দিয়ে ছবির পর-ছবি তুলে যেতে লাগল।

বেলা যত বাড়তে থাকল, ততই জমে উঠতে লাগল অনুষ্ঠান। কখনও সমবেত নৃত্য, আবার কখনও বা ডুগডুগি বাজিয়ে একক নৃত্য। একের পর-এক চলতেই লাগল। নীলাঞ্জন আর শুভমদের ঠিক উলটো দিকেই বসে ছিল জনাপঞ্চাশেক ছোট ছেলে। মাঝে-মাঝেই তারা হাততালি দিয়ে নিজেদের ভাষায় চিৎকার করে উঠছিল। শুভমের হঠাৎ মনে হল, ছেলেদের সেই ভিড়ের মধ্য থেকে তার দিকে তাকিয়ে একটা ছেলে যেন হাসছে। ভাল করে তাকাতেই তাকে চিনতে পারল সে। এ হল সেই ছোট লামাটি! আর তাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই গত কাল রাতের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। ঘুম থেকে ওঠার পর সে সত্যি-সত্যিই একদম ভুলে গিয়েছিল ব্যাপারটা। নীলাঞ্জনকে শুভম তার পাশে বসা ছেলেটিকে দেখাতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটি। এর পর আর শুভমের নাচের দিকে মন বসল না। তার দৃষ্টি বারবার চলে গেল সেই ছোট লামাদের দঙ্গলের উপর। কিন্তু সে আর দেখতে পেল না সেই ছেলেটিকে। শুভম ভাবল, ঘরে ফিরে কাল রাতের ঘটনাটা সে খুলে বলবে নীলাঞ্জনকাকুকে।

নাচ যখন শেষ হল, সূর্য তখন প্রায় মাথার উপর। শুভমকে নিয়ে নীলাঞ্জন ফিরে চলল মনাস্ট্রির পিছন দিকে, নিজেদের ঘরে। মনাস্ট্রির পাশের একটা ছোট গলিপথ দিয়ে তারা যখন নিজেদের ঘরের কাছে চলে এসেছে প্রায়, এমন সময় নীলাঞ্জনের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা ক্যামেরার লেন্স-কভারটা মাটিতে পড়ে গেল। শুভম সেটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য একটু নিচু হতেই একটা পাথরের টুকরো তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ঠক করে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ল। শুভম মাথাটা হঠাৎ না ঝোঁকালে পাথরের টুকরোটা নির্ঘাত তার কপালে এসে লাগত। চমকে উঠে সামনের দিকে তাকাতেই নীলাঞ্জন দেখতে পেল, একটা ছোট ছেলে দৌড়ে পাহাড়ের ঢালে জঙ্গলের দিকে নেমে গেল। ঢাল বেয়ে নামার সময় একবার মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য পিছনে তাকিয়েছিল সে, আর তাতেই তাকে চিনতে পেরে গেল শুভম। সে বলে উঠল, "ছেলেটি তো খুব দুষ্টু, কাল ওর জিনিসটা ওকে ফিরিয়ে দিলাম, তবুও ও পাথর ছুড়ে মারল!"

শুভমের কথাটা বুঝতে না পেরে নীলাঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "মানে?"

একটু ভয়ে-ভয়ে শুভম কাল রাতের সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল তাকে।

ঘরে ঢুকে নীলাঞ্জন খাটের উপর চুপচাপ বসে ছিল। গত কাল রাতে কৃষ্ণলামার জপযন্ত্রটা চাওয়া, রাতে ঘরে ঢুকে ছেলেটির চুপিচুপি জপযন্ত্রটা নিয়ে যাওয়া, একটু আগে ছেলেটির পাথর ছুড়ে মারা, সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে কেমন গোলমেলে মনে হতে লাগল। শুভম জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে নীলাঞ্জনকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বলল, "নীলাঞ্জনকাকু, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?"

নীলাঞ্জন বলল, "না, তবে বাইরে বেড়াতে এসে কোনও কিছু করার আগে বড়দের জিজ্ঞেস করা উচিত।"

নীলাঞ্জনের কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন কৃষ্ণলামা। নীলাঞ্জন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বসার জন্য অনুরোধ জানাল। লামা কিন্তু বসলেন না, নীলাঞ্জনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বললেন, "আশা করি আমাদের মুখোশ নাচের উৎসব আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছে। রাতে আমার আর-একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে। তার প্রস্তুতির জন্য আমাকে এখন ব্যস্ত থাকতে হবে। হয়তো কাল সকালে আপনাদের বিদায় দেওয়ার সময় ছাড়া আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না। আপনাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, বৌদ্ধ শিল্পকলার দুষ্প্রাপ্য কিছু নিদর্শন আমি আপনাকে দেখাব। একটু পরে আমার একজন লোক এসে গুম্ফার ভিতর সেসব আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাবে। তবে জিনিসগুলো সম্পর্কে বুঝতে কোনও অসুবিধে হবে না। কারণ, সেগুলোর সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা চিরকুট সুতো দিয়ে আটকানো আছে। তা থেকেই যা জানার তা আপনি জানতে পারবেন।"

একটানা এই কথাগুলো বলার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন লামা। তারপর নীলাঞ্জনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আমার কালকের অনুরোধটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার? এবার আমাকে আপনাদের কাছে রাখা জপযন্ত্রটা দিয়ে দিন।"

নীলাঞ্জন কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। তাকে উত্তর না দিতে দেখে লামা এবার বলে উঠলেন, "আপনি মনে হয় ওটা এই ছোট ছেলেটির খেলনা বলে দিতে ইতস্তত করছেন। ওর জন্য আমি আর-একটা জপযন্ত্র এনেছি।" বলে তিনি তাঁর পোশাকের ভিতর থেকে আর-একটা সুন্দর দেখতে জপযন্ত্র বের করলেন। জিনিসটা যে রুপোর তৈরি এবং বেশ দামি, তা দেখেই বুঝতে পারল নীলাঞ্জন। তার গায়ে বেশ কয়েকটা ছোট-ছোট লাল পাথর বসানো আছে।

লামা সেই পাথরগুলোকে দেখিয়ে বললেন, "এই পাথরগুলো হল চুনি। এই মূল্যবান জিনিসটা আমি এই ছেলেটিকে উপহার দিচ্ছি।" বলে তিনি জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটা শুভমের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

শুভম কিন্তু সেটা নিল না। কী করবে তা বুঝতে না পেরে সে নীলাঞ্জনের দিকে তাকাল। নীলাঞ্জন প্রথমে ভাবল, সত্যি কথাটাই লামাকে বলা ভাল। তাই বলল, "জিনিসটা আপনার হাতে তুলে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, জিনিসটা যার, সে সেটা ফেরত নিয়ে গিয়েছে।"

নীলাঞ্জনের কথা শোনামাত্র কৃষ্ণলামা শুভমের দিক থেকে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর চিৎকার করে বলে উঠলেন, "মিথ্যেবাদী, আপনি কি আমাকে ছোট ছেলে পেয়েছেন? জপযন্ত্রটা যার, তার পক্ষে এখানে আসা কোনওমতেই সম্ভব নয়। আপনি নিজেই জানেন না, আপনি কত বড় মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করছেন।"

নীলাঞ্জনকে বিনা কারণে মুখের উপর মিথ্যেবাদী বলায় সে এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল, "জপযন্ত্রটা যখন আপনার নয়, তখন আপনিই বা জিনিসটা নেওয়ার জন্য এত আগ্রহী কেন? আমাকেই বা শুধু-শুধু মিথ্যেবাদী বলছেন কেন?"

কৃষ্ণলামা তাঁর রাগ এবার যেন কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, "শুনুন তা হলে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। তখন এই মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন আমাদের তান্ত্রিক গুরু লামা ডে-ছেন-পো। একদিন তিনি তাঁর শিষ্যদের ডেকে জানালেন যে, তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা প্রয়োজন। কারণ, এই পৃথিবীতে তাঁর কাজ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু কে হবেন পরবর্তী মঠাধ্যক্ষ? স্রোঙচেন রাজবংশের এক বংশধর তখন এই গুম্ফায় বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল স্রোঙচেন পাউ। তিনি এবং আমি দু'জনেই তখন যুবক এবং দু'জনেই সেই সময় ছিলাম এই মঠের উপাধ্যক্ষ। কাজেই পরবর্তী অধ্যক্ষ নির্বাচন করতে হলে আমাদের দু'জনের মধ্যেই কাউকে বেছে নিতে হয়। শুরুতে ডে-ছেন-পো'র ইচ্ছে ছিল পাউকেই করা হোক পরবর্তী মঠাধ্যক্ষ। কারণ, তাঁর নাকি শাস্ত্রজ্ঞান আমার চেয়ে বেশি ছিল! কিন্তু আমিই বা এই সুযোগ ছেড়ে দেব কেন? তার চেয়ে আমি কম কিসে? কাজেই এই নিয়ে চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল নিজেদের মধ্যে।

অবশেষে গুরু ডে-ছেন-পো'ই একটা সমাধানের রাস্তা বের করলেন। ঠিক হল, আমাদের মধ্যে যে-কোনও একজন লামা ডে-ছেন-পো'র মৃত্যুর পর মঠাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তিন যুগ পর সেই দায়িত্ব সে তুলে দেবে তার অন্য কোনও বংশধরের হাতে। যদি দ্বিতীয়জন বা তার কোনও বংশধর এই সময়কালের মধ্যে জীবিত না থাকে বা যেদিন তিন যুগ পূর্ণ হচ্ছে সেদিন এখানে উপস্থিত না হতে পারে, তা হলে মঠের কর্তৃত্ব চিরদিনের জন্য চলে যাবে প্রথমজনের হাতে। কিন্তু আবার এক সমস্যা, কে প্রথমে পালন করবে মঠাধ্যক্ষের দায়িত্ব? এরও সমাধান করলেন লামা ডে। আমাকে আর পাউকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তিনি এক তৃণখণ্ড ছুড়ে দিলেন আকাশের দিকে। সেটা বাতাসে ভাসতে-ভাসতে এসে পড়ল আমার মাথায়। প্রথম মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলাম আমি।"

এই পর্যন্ত বলে লামা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, "আমাদের গুরু ছিলেন তন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। তাঁর কাছে ছিল দু'টো মন্ত্রপূত জপযন্ত্র। সেই দু'টো হাতে নিয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে উড়ে যেতে পারতেন এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে। জপযন্ত্র দিয়ে তিনি অপদেবতাদের বশ মানাতে পারতেন। যদিও পরবর্তী মঠাধ্যক্ষ হিসেবে সেই দু'টো আমারই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু গুরু ডে-ছেন-পো তার একটা দিলেন আমাকে। আর-একটা দিলেন পাউকে। ঠিক হয়েছিল পাউ বা পাউয়ের কোনও বংশধর যেদিন দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য এখানে আসবে, সেদিন সঙ্গে করে ওই জপযন্ত্রটা আনতে হবে। না হলে এই মঠে তার প্রবেশাধিকার থাকবে না।

এই সব ঘটনার কয়েক বছরের মধ্যেই গুরু লামা ডে দেহরক্ষা করেন ও পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থামতো আমিও মঠাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করি। পাউ কিন্তু আর এখানে থাকেনি। সেই দিনই সে গুরু ডে-ছেন-পো'র দেওয়া জপযন্ত্রটা সঙ্গে নিয়ে পাড়ি জমায় তিব্বতে। সেদিনও ছিল ছাম উৎসব। আজ থেকে ঠিক তিন যুগ আগে। তিব্বতে গিয়ে সে বসবাস করতে শুরু করল লাসাতে। সেখানে সে সংসারও পাতে। বছরদশেক আগে তার নাকি এক সন্তানও জন্মেছিল। কিন্তু তার কয়েক দিনের মধ্যেই অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর হাতে খুন হয় পাউ ও তার স্ত্রী। আততায়ীর হাত থেকে পাউয়ের নবজাতককে বাঁচানোর জন্য পাউয়ের সহযোগী একজন লামা শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তিনিও আর জীবিত নেই। কারণ, মা ছাড়া ওইটুকু শিশুর বরফের দেশে বাঁচা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে।"

নীলাঞ্জনের মনে হল, এই শেষ কথাগুলো বলার সময় লামার চোখ দু'টো যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। কৃষ্ণলামা এর পর বললেন, "এবার আসি আসল কথায়। এবার নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন, কেন আমি আপনার মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলতে পারলাম। আমার ধারণা পাউয়ের জপযন্ত্রটা কোনওভাবে কিউরিও ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরতে-ঘুরতে তিব্বত থেকে চলে এসেছিল গ্যাংটকের কোনও দোকানে, আর সেখান থেকেই ওটা আপনি সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু যেহেতু ওই জপযন্ত্রটা এখানকার সম্পত্তি, তাই আমি সেটা আপনার কাছ থেকে দাবি করতেই পারি। এর জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতেও আমি প্রস্তুত।" এই বলে কৃষ্ণলামা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নীলাঞ্জনের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত পর নীলাঞ্জন লামার দিকে তাকিয়ে বলল, "এমনও তো হতে পারে যে, লামা পাউয়ের ছেলে জীবিত আছে,

তার কাছ থেকেই আমরা জপযন্ত্রটা পেয়েছিলাম, আবার সে-ই এসে তার জিনিসটা ফেরত নিয়ে গিয়েছে?"

কৃষ্ণলামা গম্ভীর স্বরে এবার বললেন, "মিথ্যে কেন কথা বাড়াচ্ছেন আপনি? সেই ছেলে যদি জীবিতও থাকে, তা হলে তার পক্ষে দুর্গম পাহাড় ডিঙিয়ে এত দূর আসা সম্ভব নয়। আর, আমার লোকজনের চোখ এড়িয়ে এই মঠে প্রবেশ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য।" এর পর লামা কিছুটা নির্দেশের সুরেই বললেন, "জিনিসটা এবার আমাকে দিয়ে দিন। আজ রাতে আমি তন্ত্রবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করতে চলেছি। তার কিছু আয়োজন এখনও বাকি আছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না," এই বলে কৃষ্ণলামা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন নীলাঞ্জনের দিকে।

নীলাঞ্জন এবার কৃষ্ণলামার চোখে চোখ রেখে বলল, "আমি তো আপনাকে বলেইছি যে, জিনিসটা আমার কাছে নেই, যার জিনিস সে নিয়ে গিয়েছে।"

নীলাঞ্জনের কথা শুনে দপ করে জ্বলে উঠল কৃষ্ণলামার চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, "তা হলে এত অনুরোধ সত্ত্বেও জিনিসটা আপনি দিলেন না?" নীলাঞ্জন আর শুভমের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঝড়ের বেগে কৃষ্ণলামা বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

॥ ৭ ॥

কৃষ্ণলামা চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ খাটের উপর চুপ করে বসে রইল নীলাঞ্জন। তার এখন কী করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। একবার তার মনে হল, কৃষ্ণলামার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা উচিত। পরক্ষণেই মনে হল, কৃষ্ণলামা কিছুতেই তার কথা বিশ্বাস করবেন না। সবচেয়ে ভাল হত, যদি সে এই মুহূর্তে মনাস্ট্রি ছেড়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব নয় তার পক্ষে। পাহাড়ি রাস্তায় পথ চেনা সম্ভব নয়। আর, কৃষ্ণলামাও নিশ্চয়ই তার কাছে জপযন্ত্রটা যে নেই, সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে এত সহজে তাকে ছেড়ে আসতে রাজি হবেন না। এমনকী, আরও কয়েক দিন তাদের এখানে আটকে রাখতেও পারেন। যদি এমন হয়, তা হলে আর দুর্গতির শেষ থাকবে না নীলাঞ্জনদের। আসলে, একজন অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস করে এরকম অজানা জায়গায় যে আসা ঠিক হয়নি, এবার তা ভালভাবে বুঝতে পারল সে। বিশেষত, যখন তার সঙ্গে একটা ছোট ছেলে রয়েছে।

এই সব চিন্তা করে নীলাঞ্জনের মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। একটা সিগারেট খাওয়ার জন্য নীলাঞ্জন খাট থেকে উঠে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু একটা যে হয়েছে এবং সেটা যে ওই জপযন্ত্রটা নিয়ে, সেটা লামা ও নীলাঞ্জনের উত্তেজিত কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল শুভম। সে এতক্ষণ চুপচাপ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এসব দেখে তারও কেমন ভয়-ভয় করছিল। নীলাঞ্জন বাইরে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গেই সে ঘরের বাইরে এসে নীলাঞ্জনের পিছনে দাঁড়াল। কয়েক পা হেঁটে নীলাঞ্জন হাজির হল সেই কাঠের বাথরুমের পাশে খাদের ধারে। শুভম তার পিছু-পিছু গিয়ে দাঁড়াল একটা পাথরের উপর।

চার পাশ এখন নিস্তব্ধ। মনাস্ট্রির কোলাহলও থেমে গিয়েছে অনেক ক্ষণ আগেই। নীচের জঙ্গল থেকে মাঝে-মাঝে শুধু ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক, আর বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ। মাঝে-মাঝে ঠান্ডা বাতাস এসে বিঁধছে চোখে-মুখে। পাথরের উপর দাঁড়িয়ে শুভম তাকাল নীচের দিকে। নীলাঞ্জন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তার থেকে একটা নিয়ে ঠোঁটে দিল। সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে রেখে নীলাঞ্জন লাইটারটা অন্য পকেট থেকে বের করে সিগারেটটা জ্বালাতে যেতেই শুভম পাথরটা থেকে নেমে এসে খামচে ধরল তার হাত। নীলাঞ্জন ফিরে তাকাল তার দিকে। নীলাঞ্জনকে ইশারায় চুপ করতে বলে শুভম তার হাত ধরে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল পাথরটার উপর, তারপর আঙুল দিয়ে নীচের দিকে দেখাল।

নীচে তাকিয়ে নীলাঞ্জন প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে পাইন, দেবদারু আর বাঁশের ঘন জঙ্গল। কিন্তু ভাল করে লক্ষ করে দেখতে পেল, সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার বেশ খানিকটা নীচে জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢালু ছাদওলা একটা কাঠের বাড়ি। বাড়িটার গায়ের রং সবুজ, তাই হঠাৎ নীচের দিকে তাকালে তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। বাড়িটা দেখার পর আরও একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল তার। সেই ছোট ছেলেটা সন্তর্পণে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটার দিকে। নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই ব্যাপারটার মধ্যে কোনও রহস্য আছে। আরও একটা ব্যাপার সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় এল তার। এই ছেলেটিকে যদি কৃষ্ণলামার কাছে হাজির করা যায়, তা হলে নীলাঞ্জনদের সমস্যার সমাধান হবে।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এই ছেলেটি যদি সত্যি-সত্যিই স্রোঙ্‌চেন রাজবংশের অর্থাৎ লামা পাউয়ের সন্তান হয়ে থাকে এবং যদি সে তার অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য এসে থাকে, তা হলে কৃষ্ণলামা কি জীবিত রাখবেন তাকে? লামা পাউয়ের হত্যার ঘটনাটা বলার সময় কৃষ্ণলামার চোখ দু'টো কেমন জ্বলজ্বল করে উঠেছিল, সেটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল নীলাঞ্জনের। হয়তো বা এই মঠের উপর তার অধিকার চিরদিনের মতো প্রতিষ্ঠা করার জন্য কৃষ্ণলামাই তাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে।

নীলাঞ্জন দেখল, ছেলেটি কিন্তু একবারও পিছনের দিকে তাকাচ্ছে না। তার দৃষ্টি শুধু জঙ্গলের আড়ালে বাড়িটার দিকে নিবদ্ধ। হয়তো বাড়িটার ভিতর থেকে কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে, এই ভয় করছে সে। কারণ, ঢাল বেয়ে কিছুটা নামার পরই মাঝে-মাঝে থেমে গিয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকছে সে। একটা অদম্য কৌতূহল পেয়ে বসল নীলাঞ্জনকে। শুভমকে সেখানেই দাঁড়াতে বলে নীলাঞ্জনও খাদের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অনেকটা নীচে নেমে গেল। ততক্ষণে ছোট লামাটি পৌঁছে গিয়েছে বাড়িটার কাছাকাছি। বাড়িটার কাছে এসে একটা মোটা দেবদারু গাছের আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে ভাল করে লক্ষ করতে লাগল ছেলেটি। নীলাঞ্জনও তার হাতবিশেক পিছনে একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। বাড়ির এক পাশের প্রায় গোটাটাই এবার দেখতে পেল নীলাঞ্জন।

প্যাগোডা ধাঁচের এই বাড়িটাও যে বেশ পুরনো, তা বুঝতে পারল নীলাঞ্জন। বাড়িটার দরজাজানলা সব বন্ধ। বড় কয়েকটা গাছ ঘিরে আছে। ছেলেটি মিনিটদশেক গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাল করে বাড়িটাকে দেখে নিল। তারপর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাড়িটার কাছে গিয়ে তার পিছনে অদৃশ্য হল।

নীলাঞ্জনও এবার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাড়িটায় কেউ থাকে বলে মনে হল না তার। বাড়িটার ঢালু ছাদ আর জানলার কারনিসে পুরু হয়ে জমে রয়েছে পচা পাতার রাশি। সরাসরি এখানে সূর্যের আলো এসে পড়ে না বলে জায়গাটাও কেমন স্যাঁতসেঁতে। ছেলেটি যেদিকে গিয়েছে, বাড়িটাকে বেড় দিয়ে নীলাঞ্জনও এগিয়ে গেল সেদিকে। প্যাগোডা ধাঁচের হলেও বাড়িটার একটা অংশ এল-এর মতো। বাড়িটার পিছন দিকে যেতেই নীলাঞ্জন দেখতে পেল, সেই এলের মতো অংশের বন্ধ দরজার গায়ে কান লাগিয়ে কী একটা শোনার চেষ্টা করছে ছেলেটি। দরজাটা তো বাইরে থেকে একটা আড়াআড়ি কাঠ দিয়ে পেরেক ঠুকে বন্ধ করা। তা হলে ঘরের ভিতর ছেলেটি কীসের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে? কাউকে ঘরের ভিতর রেখে কি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না নীলাঞ্জন।

বাড়ির এদিকের অংশের ছাদটা লম্বা-লম্বা কাঠের থাম দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে। ছেলেটি যাতে তাকে দেখতে না পায়, তাই নীলাঞ্জন একটা থামের আড়াল থেকে লক্ষ করতে লাগল ছেলেটিকে। বেশ কিছুক্ষণ দরজার গায়ে কান লাগিয়ে রাখার পর তার মুখে যেন ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। দরজা থেকে এবার সরে এসে চার পাশের মাটিতে সে কী যেন একটা খুঁজতে শুরু করল। কিছু দূরে মাটির উপর পড়ে ছিল হাতচারেক লম্বা একটা শক্ত গাছের ডাল। তার উপর চোখ পড়তেই ছেলেটি গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিল। তারপর ফিরে এসে ডালের ছুঁচলো দিকটা দিয়ে দরজার গায়ে আটকানো কাঠের তক্তার নীচে ধীরে-ধীরে চাড় দিতে লাগল। নীলাঞ্জন বুঝল, ছেলেটি তক্তাটা খোলার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্দেশ্য সফল হল ছেলেটির। তক্তার একটা দিক পেরেক থেকে আলগা হয়ে গেল। ছেলেটি এর পর টান মেরে দরজা থেকে তক্তাটা উপড়ে ফেলল। খুলে গেল দরজাটা। চার পাশে ভাল করে তাকিয়ে ছেলেটি ঘরের ভিতর ঢুকে পাল্লা দু'টো আবার ভেজিয়ে দিল।

কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর নীলাঞ্জন এসে দাঁড়াল দরজাটার সামনে। তারপর পাল্লার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে চোখ রাখল। ঘরের ভিতরে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। শুধু ভিতর থেকে গোঙানির একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ ঘরের ভিতর সে একটা খুট করে শব্দ শুনল, আর তার পরই বাইরের আলোয় ঘরের অন্ধকার কেটে গেল। নীলাঞ্জন দেখল, ঘরের ভিতরের একটা নিচুমতো জানলা খুলে ফেলেছে ছোট ছেলেটি। জানলাটা খোলার পর ছেলেটি এগিয়ে গেল লম্বা ঘরটার একটা কোনার দিকে। সন্তর্পণে দরজার পাল্লাটা ফাঁক করে নীলাঞ্জন তাকাল সেই দিকে। দেখল, ঘরের এক কোনায় কাঠের মেঝের উপর হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি ছেলে। গোঙানির শব্দটা ভেসে আসছে তার কাছ থেকেই।

নীলাঞ্জন বুঝতে পারল যে, একটু আগে দরজার গায়ে কান পেতে এই শব্দটাই শোনার চেষ্টা করছিল ছোট লামাটি। মাটিতে যে ছেলেটি শুয়ে আছে, তার মুখের আদল তিব্বতিদের মতো হলেও পোশাক দেখে তাকে গুম্ফায় থাকা ছোট লামাদের মতো মনে হল না নীলাঞ্জনের। মাথাও তার কামানো নয়। শতচ্ছিন্ন জামাপ্যান্ট পরা যেসব তিব্বতি ছেলেকে অনেক সময় গ্যাংটকের রাস্তায় ভিক্ষে করতে দেখা যায়, এ ছেলেটাকে দেখে সেরকমই মনে হল নীলাঞ্জনের। ছোট লামাটি ছেলেটির মুখের বাঁধনটা খুলে দিতেই গোঙানি বন্ধ করে আস্তে-আস্তে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে উঠে বসল সে। এর পর নিচু গলায় দু'জনে কথা বলতে শুরু করল।

নীলাঞ্জনের মনে হল, ছোট লামাটি যেন তাকে প্রশ্ন করছে, আর ছেলেটি তার উত্তর দিচ্ছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তারা কী কথা বলছে, তা শুনতে পাচ্ছিল না নীলাঞ্জন। অবশ্য শুনতে পেলেও তার কোনও লাভ হত না। কারণ, তারা যে ভাষায় কথা বলছে, তা জানা নেই নীলাঞ্জনের। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ছোট লামাটি উঠে দাঁড়াল। তারপর কোমরের নীচ থেকে টেনে বের করল সেই জপযন্ত্রটা। নীলাঞ্জন দেখল, জপযন্ত্রটা বের করার সঙ্গে-সঙ্গেই বসে থাকা ছেলেটি চোখ বন্ধ করে ফেলল। জপযন্ত্রটা হাতে ধরে ছোট লামাটি কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। জপযন্ত্রটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল ছেলেটির কপালে। একটা মৃদু আর্তনাদ করে ছেলেটি মাথাটা ঝুঁকিয়ে দু' হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরল। ছোট লামাটি এবার জপযন্ত্রটা কোমরে গুঁজে বসে পড়ল ছেলেটির পাশে। তার পর তার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি মাথা তুলল। নীলাঞ্জন দেখতে পেল, তার কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আস্তে-আস্তে ছেলেটি হাত সরিয়ে নিল কপাল থেকে। জপযন্ত্রটার আঘাতে তার কপালের এক পাশে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। নীলাঞ্জনের কেন যেন মনে হল, ছোট লামাটিকে সে ইচ্ছে করেই আঘাত করতে দিয়েছে। ছেলেটি এবার ছোট লামাটির দিকে তাকিয়ে হাসল। আর, সে পরম মমতায় হাত বোলাতে লাগল ছেলেটির ক্ষতস্থানের চার পাশে। নীলাঞ্জন বুঝতে পারছিল না, এখন তার কী করা উচিত। হঠাৎই নীলাঞ্জনের হাতের চাপে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হয়ে পাল্লাটা ফাঁক হয়ে গেল। শব্দটা শুনতে পেয়েই চমকে উঠে ছেলে দু'টো দরজার দিকে তাকিয়ে নীলাঞ্জনকে দেখতে পেয়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ছোট লামাটি।

তারপর বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। নীলাঞ্জন দেখল, মাটিতে বসে থাকা ছেলেটি ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। নীলাঞ্জন এবার দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতে যাবে, ঠিক সেই সময় পিছনে একটা খসখস শব্দ শুনতে পেল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাতেই মাথায় কীসের একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে গেল নীলাঞ্জন। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কৃষ্ণলামার মুখ। মুহূর্তেই জ্ঞান হারাল নীলাঞ্জন।

পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নীচে নামার পর এক সময় শুভমের চোখের সামনে থেকে গাছে ঢাকা বাড়িটার আড়ালে হারিয়ে গেল নীলাঞ্জন। শুভম দাঁড়িয়ে রইল পাথরটার উপর। আধ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও যখন নীলাঞ্জনকাকু ফিরে এল না, তখন তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। কী করবে সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

আরও কিছুক্ষণ পর শুভম দেখল, কৃষ্ণলামা আর তাঁর সঙ্গী বামনলামা সেই গাছে ঢাকা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে উপর দিকে উঠতে শুরু করলেন। তাঁরা শুভমকে দেখার আগেই শুভম পাথরটা থেকে চট করে নেমে ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ল।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল, নীলাঞ্জন কিন্তু ফিরল না। বিছানায় শুয়ে শুভম ভাবতে লাগল, সে এখন কী করবে! হঠাৎ দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে বিছানার উপর উঠে বসল শুভম। দরজাটা খুলে গেল, ঘরের ভিতর বামনলামাকে নিয়ে ঢুকলেন কৃষ্ণলামা। বামনলামার কাঁধে তাঁর পোষা সেই বাঁদরটা, আর হাতে একটা গোলমতো পাত্র। বামনলামা ঘরে ঢোকার পর কী যেন একটা বললেন, আর বাঁদরটাও তাঁর কাঁধ থেকে নেমে এক লাফে খাটের উপর শুভমের কাছ থেকে একটু দূরে বসল। বামনলামা এবার তাঁর হাতের পাত্রটা নিয়ে এগিয়ে এলেন শুভমের দিকে। পাত্রটার মধ্যে দুধের মতো দেখতে একটা তরল পদার্থ রয়েছে। তবে, সেটা যে দুধ নয়, পাত্রটা কাছে আনার পর তার উৎকট গন্ধেই তা বুঝতে পারল শুভম।

কৃষ্ণলামা এবার শুভমের দিকে তাকিয়ে সেটা খেয়ে নেওয়ার জন্য ইশারা করলেন। বামনলামা পাত্রটা তুলে ধরলেন শুভমের মুখের কাছে। শুভম বামনলামার হাতটা পাত্রসুদ্ধ ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল। পাত্রের তরলের কিছুটা চলকে পড়ল বিছানায় আর মেঝেয়। বামনলামা এবার খাটে বসা বাঁদরটার উদ্দেশে কী একটা উচ্চারণ করলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে সে শুভমের আর-একটু কাছে চার পায়ে ভর দিয়ে এসে দাঁত খিঁচোতে শুরু করল। বাঁদরটাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল শুভম। সে বুঝতে পারল, জিনিসটা না খেলে তাঁরা হয়তো বাঁদরটাকে তার উপর লেলিয়ে দেবেন। তাই বামনলামা পাত্রটা আর-একবার তার মুখের কাছে আনতেই সে এক চুমুকে সেই বিস্বাদ তরলটা খেয়ে নিল। সেটা খাওয়ার পরই শুভমের মাথার ভিতরটা কেমন যেন করতে লাগল। সংজ্ঞাহীন না হলেও সে কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শুয়ে পড়ল খাটের উপর।

এক সময় বাইরে অন্ধকার নেমে এল। তারপর কারা যেন তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে, লামাদের মতো পোশাক পরিয়ে, সারা মুখে ঘিয়ের মতো কীসব মাখিয়ে দিল। তারপর তার গলায় অদ্ভুত ধরনের একটা মালা পরিয়ে, বেশ কিছুটা হাঁটিয়ে তাকে একটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে উঁচুমতো একটা জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হল। ঘরটা ধোঁয়ায় ভর্তি। এসব ব্যাপার স্বপ্ন না সত্যি, ঘোরের মধ্যে বুঝতে পারল না শুভম। সে বসে-বসে ঢুলতে লাগল। কানে বাজতে লাগল শুধু ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ শব্দ।

॥ ৮ ॥

মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর কিছু ক্ষণের মধ্যেই আবার জ্ঞান ফিরে এল নীলাঞ্জনের। চোখ খুলে সে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণলামা আর বামনলামা। বামনলামার হাতে একটা সরু লিকলিকে চামড়ার চাবুক। তার মাথায় আবার একটা ধাতুর ডেলা বাঁধা। নীলাঞ্জনের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কৃষ্ণলামা বললেন, "শেষবারের মতো বলছি, জপযন্ত্রটা আমাকে দিয়ে দিন।"

নীলাঞ্জন অতি কষ্টে উত্তর দিল, "বলছি তো, সেটা আমার কাছে নেই।"

কৃষ্ণলামা এবার চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, "জিনিসটা যে আপনার কাছে নেই, তা আমি জানি। আপনি যখন উৎসব দেখছিলেন, তখন আমার লোক সেটা খুঁজতে আপনার ঘরে গিয়েছিল। কিন্তু তারা সেটা পায়নি। জিনিসটা কোথায় লুকিয়েছেন, সেটাই আমি জানতে চাইছি।"

নীলাঞ্জন উত্তর দিল, "আপনাকে আমি সত্যি কথাই বলছি। যার জিনিস, সেটা সে এসে নিয়ে গিয়েছে।"

কৃষ্ণলামা এবার চিৎকার করে উঠলেন, "আবার মিথ্যে কথা! শুনে রাখুন, যতক্ষণ না ওটা দিচ্ছেন, ততক্ষণ এখানেই থাকতে হবে আপনাকে।"

এর পর কৃষ্ণলামা কী একটা বললেন বামনলামাকে। নীলাঞ্জন শুধু দেখল, বামনলামার চাবুকসমেত হাতটা একবার মাথার উপর উঠল। পরমুহূর্তেই মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারাল নীলাঞ্জন।

যখন নীলাঞ্জনের জ্ঞান ফিরে এল, তখন প্রথমে কিছুই মনে করতে পারল না সে। তার চার পাশে শুধুই অন্ধকার। ডান চোখের উপরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে তার। আস্তে-আস্তে একটা হাত সে মুখের কাছে নিয়ে এল। সারা মুখ তার চটচট করছে। একটু পরেই নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, সেটা রক্ত। কিন্তু অন্ধকার ঘরে সে এই অবস্থায় শুয়ে আছে কেন? শুয়ে-শুয়ে এটাই সে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল নীলাঞ্জন। কিন্তু অন্ধকার ঘরের কোন দিক থেকে শব্দটা হল, বুঝতে পারল না সে। হঠাৎ একটা ক্ষীণ আলো ফুটে উঠল ঘরের মধ্যে। নীলাঞ্জন দেখল, একটা আলোর শিখা কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। আলোটা একটু কাছে এসেই থেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, সেটা একটা প্রদীপ। আস্তে-আস্তে নীলাঞ্জনের চোখের সামনে ফুটে উঠল প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বৃদ্ধ লামার মুখ। তিনি ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে নীলাঞ্জনকে চুপ করে থাকতে ইশারা করলেন। তারপর এগিয়ে এলেন নীলাঞ্জনের আরও কাছে।

নীলাঞ্জন এবার উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। মাথাটা তার পাথরের মতো ভারী মনে হতে লাগল। বৃদ্ধ লামাটি প্রদীপটি মাটিতে নামিয়ে রেখে তার পাশে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নীলাঞ্জনের মনে হল, সে লোকটিকে আগে কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে, তা কিছুতেই মনে করতে পারল না। লোকটি নীলাঞ্জনকে তুলে ধরে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলেন, তারপর তাঁর পোশাকের ভিতর থেকে একটা পাত্র বের করে ঠান্ডা জল ঢেলে দিলেন নীলাঞ্জনের মুখে। জলটা খাওয়ার পর নীলাঞ্জন যেন একটু ধাতস্থ হল। সে বারবার মনে করার চেষ্টা করতে লাগল, সে এখন কোথায়!

বৃদ্ধ লামা প্রদীপটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন,

তারপর নীলাঞ্জনকেও উঠে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করলেন। প্রচণ্ড কষ্ট হলেও নীলাঞ্জন দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়ে এক সময় উঠে দাঁড়াল। একটু চেষ্টার পর সে হাঁটতেও পারল। নীলাঞ্জন তাঁর পিছন-পিছন গিয়ে দাঁড়াল ঘরের এক কোনায়। লামা এবার প্রদীপটা হাতে নিয়ে একটু নিচু হলেন। নীলাঞ্জন দেখতে পেল, কাঠের দেওয়ালের নীচের দিকের এক জায়গায় কয়েক হাত কাঠের পাটাতন কে যেন সরিয়ে ফেলেছে। অনায়াসেই ওই জায়গা দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

কিছু ক্ষণের মধ্যেই সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াল। বাইরে ফটফট করছে জ্যোৎস্না। সেই আলোয় আকাশের বুকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতশৃঙ্গগুলো দুধের মতো সাদা দেখাচ্ছে। মাথার উপর বিরাট রুপোর থালার মতো চাঁদের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নীলাঞ্জন। এত বড় চাঁদ এর আগে কোনওদিন দেখেনি সে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎই নীলাঞ্জনের মনে পড়ে গেল সব কিছু। বুঝতে পারল যে, সে দাঁড়িয়ে আছে গাছে ঘেরা বাড়িটার সামনে। সামনের ছোট পাহাড়টার মাথার উপর মনাস্ট্রির চূড়াটাও চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

বাইরে বেরিয়ে আসার পর প্রদীপটা নিভিয়ে ফেলেছিলেন বৃদ্ধ লামা। কারণ, তার আর কোনও দরকার ছিল না। নীলাঞ্জনকে নিয়ে সন্তর্পণে সামনের পাহাড় ভেঙে মনাস্ট্রির দিকে উঠতে শুরু করলেন তিনি। নীলাঞ্জন ততক্ষণে চিনে ফেলেছে এই লামাটিকে। এঁকেই নীলাঞ্জনরা আহত অবস্থায় রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল গ্যাংটকের হাসপাতালে। তার পর থেকেই সব ঘটনার শুরু।

এক সময় নীলাঞ্জনরা উঠে এলেন সেই পাথরটার কাছে, যেখানে শুভমকে দাঁড় করিয়ে রেখে নীচে নেমেছিল নীলাঞ্জন। শুভমের যদি ওঁরা কোনও ক্ষতি করে থাকেন, তা হলে ওর বাবা-মা'র সামনে গিয়ে নীলাঞ্জন দাঁড়াবে কীভাবে! এই কথাটা মনে হতেই শরীরের সব কষ্ট ভুলে গেল নীলাঞ্জন। শুধু একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা পাক খেতে লাগল তার মনের মধ্যে।

উপরে উঠে আসার পর নীলাঞ্জন চার পাশে কাউকে দেখতে পেল না। শুধু শুনতে পেল মনাস্ট্রির ভিতর থেকে ভেসে আসছে ডুগডুগির ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ শব্দ। পাথরটার সামনে বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়ালেন নীলাঞ্জনরা। নীলাঞ্জনের মনে হল, বৃদ্ধ লামা যেন বোঝার চেষ্টা করছেন শব্দটা মনাস্ট্রির কোন দিক থেকে ভেসে আসছে।

তারপর তিনি তাঁর জুতোর ভিতর থেকে একটা ছুরির মতো জিনিস টেনে বের করলেন। এই অস্ত্রটা একটু অদ্ভুত ধরনের, এর কোনও হাতল নেই। দু' দিকেই ফলা। চাঁদের আলোয় জিনিসটা ঝকঝক করে উঠল। অস্ত্রটা বের করার পর লামা এবার নীলাঞ্জনকে তাঁর সঙ্গে আসতে ইশারা করে এগিয়ে চললেন মনাস্ট্রির দিকে। বাইরে থেকে মনাস্ট্রির ভিতর কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না, শুধু সেই ডুগডুগির শব্দ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। মনাস্ট্রির দেওয়ালের গা ঘেঁষে লামার পিছন-পিছন সন্তর্পণে নীলাঞ্জন হাজির হল মনাস্ট্রির সদর দরজার সামনে। সেটা খোলা রয়েছে। চার পাশ ভাল করে একবার তাকিয়ে নীলাঞ্জনকে নিয়ে লামা ঢুকলেন তার ভিতরে।

মনাস্ট্রির ভিতরটাও অন্ধকার। নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, ডুগডুগির শব্দটা ভেসে আসছে প্রার্থনাকক্ষের পিছন দিকের কোনও ঘর থেকে। প্রার্থনাকক্ষের মধ্যে কেউ নেই। শুধু বুদ্ধমূর্তির সামনে একটা প্রদীপ নিভুনিভু অবস্থায় জ্বলছে। নীলাঞ্জন লামার পিছু-পিছু ঢুকল একটা ঘরের মধ্যে। তার ভিতরে জমাটবাঁধা অন্ধকার। কোনও কিছু দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজের উপর নির্ভর করে লামার মৃদু পায়ের শব্দ শুনে তাঁকে অনুসরণ করে চলল সে। বেশ কয়েকটা ঘর পার হয়ে লামা এসে দাঁড়ালেন একটা ঘরের দরজার পাশে। ঘরের ভিতরে ভীষণ জোরে একসঙ্গে এত ডুগডুগি বাজছে যে, কানে তালা ধরে যাওয়ার উপক্রম। আস্তে-আস্তে নীলাঞ্জন উঁকি দিল ভিতরে। সেখানে আলো থাকলেও সারা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। তার মধ্য দিয়ে কিছুই দেখতে পেল না সে। নীলাঞ্জন একবার তাকাল বৃদ্ধ লামার মুখের দিকে। তিনি তাকে ইশারায় দরজার পাল্লার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। মিনিট পাঁচেক পর কমে আসতে লাগল ডুগডুগির শব্দ। নীলাঞ্জন এবার শুনতে পেল, কে যেন ভারী গলায় অদ্ভুত সুর করে দুর্বোধ ভাষায় একটানা কীসব বলে চলেছেন। সম্ভবত কেউ মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। মনোযোগ দিয়ে শোনার পর নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, গলাটা কৃষ্ণলামার।

মিনিট দু'য়েক পরে ডুগডুগির শব্দ একদম থেমে গেল। শুধুই চলতে লাগল মন্ত্রোচ্চারণ। নীলাঞ্জন আর-একবার সাবধানে উঁকি মারল ঘরের ভিতর। ধোঁয়া এবার অনেকটাই কমে এসেছে। সে দেখতে পেল, একটা লম্বা ঘরের শেষ প্রান্তে উঁচু বেদির উপর বসানো আছে ভয়ালদর্শন পাথরের বিরাট মূর্তি। তার বড়-বড় দাঁত বের করা মুখের ভিতর থেকে সাপের মতো চেরা লম্বা জিভ নেমে এসেছে বুকের নীচ পর্যন্ত। লম্বা নখওলা দু' হাত থেকে ঝুলছে নরমুণ্ড। কৃষ্ণলামা সেই বিকটদর্শন মূর্তির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দু' হাত নাড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। তাঁর এক হাতে ধরা একটা লম্বা হাড়, আর-এক হাতে ধরা সেই জপযন্ত্র দু'টোর একটা। ঘরের দু' পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন জনাকুড়ি নানাবয়সি লামা। তার মধ্যে বামনলামাও আছেন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ডুগডুগি, আর বাটির মতো ছোট পাত্র। দরজার দিকে পিছন ফিরে তাঁরা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেই ভয়ংকর মূর্তি, আর কৃষ্ণলামার দিকে।

ভাল করে ঘরের ভিতর চার দিকে তাকাতেই নীলাঞ্জন হঠাৎ দেখতে পেয়ে গেল শুভমকে! ঘরের কোনায় একটা ছোট্ট বেদির উপর সে বসে-বসে ঢুলছে। তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে কালো রঙের ঢিলে পোশাক। তবে তার হাত-পা খোলা। নীলাঞ্জনের মনে হল, সে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। তার কোনও হুঁশ নেই। কৃষ্ণলামার মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল এক সময়। একটু পাশ ফিরে বামনলামাটির দিকে তাকিয়ে তিনি কী একটা ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য লামারা দুর্বোধ ভাষায় চিৎকার করে একসঙ্গে কী যেন বলে উঠলেন বেশ কয়েকবার। তারপর সকলে হাতের পাত্রে একটা চুমুক দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বামনলামা তাঁর হাতের পাত্রটি মাটিতে নামিয়ে রেখে ঘরের কোনায় শুভমের কাছে হেঁটে গেলেন। শুভমের একটা হাত ধরে মাটির উপর তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি। তারপর তাকে ধীরে-ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন সেই ভয়ংকর মূর্তির বেদির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণলামার দিকে।

শুভমকে এনে দাঁড় করানো হল কৃষ্ণলামার কাছে। কৃষ্ণলামা

এবার বেদির সামনে থেকে একটু সরে দাঁড়ালেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠল নীলাঞ্জন! বেদির ঠিক নীচে মেঝের উপর একটা হাড়িকাঠ রয়েছে, আর তার পাশেই শোয়ানো আছে একটা বিরাট ভোজালি! কৃষ্ণলামার শরীরের আড়ালে জিনিস দু'টো এতক্ষণ ঢাকা ছিল। শুভমকে হাঁটু মুড়িয়ে বসিয়ে দেওয়া হল হাড়িকাঠের সামনে। শুভম তাঁকে কোনও বাধা দিল না। ব্যাপারটা কী হতে চলেছে বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না নীলাঞ্জনের। শুভমকে ওরা এই অপদেবতার মূর্তির সামনে বলি দেবে! সঙ্গে-সঙ্গে সে ঘরের মধ্যে ঢোকার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু বৃদ্ধ লামা এক হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে আটকে দিলেন তাকে। লামার অস্ত্র ধরা অন্য হাতটা উপর দিকে উঠল এবার। আর তার পরই অস্ত্রটা ছুটে গেল সামনের দিকে। বামনলামা একটু ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন, সম্ভবত শুভমের গলাটা হাড়িকাঠের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তা আর হল না।

বৃদ্ধ লামার ছুরিটা বাতাসের মধ্যে পাক খেয়ে আমূল গেঁথে গেল বামনলামার বুকে। বামনলামার পাশে একটা কাঠের স্ট্যান্ডের মাথায় বসানো ছিল একটা বড় জ্বলন্ত প্রদীপ। বিকট চিৎকার করে সেটাকে জড়িয়ে ধরে বামনলামা পড়ে গেলেন মেঝের উপর। নীলাঞ্জনের গলা থেকেও একটা চিৎকার বেরিয়ে এল নিজের অজান্তে। সেটা শুনতে পেয়েই মনে হয় শুভম মাথা একটু উঁচু করে তাকাল সামনের দিকে। সে দেখতে পেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নীলাঞ্জনকে। সঙ্গে-সঙ্গে যেন তার ঘোর কেটে গেল। সে দাঁড়িয়ে উঠে লামাদের সারির ফাঁক দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল নীলাঞ্জনের দিকে। শুভম তার কাছে পৌঁছনোমাত্র তার হাত ধরে নীলাঞ্জন আর বৃদ্ধ লামা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটতে শুরু করলেন মনাস্ট্রির বাইরে বের হওয়ার জন্য। এসব ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, তা বুঝতে আরও কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে গেল কৃষ্ণলামা ও তাঁর সঙ্গীদের। আর তার পরেই তাঁরা পিছু ধাওয়া করলেন নীলাঞ্জনদের।

অন্ধকার ঘরগুলো কোনওরকমে পেরিয়ে মনাস্ট্রির বাইরে এল নীলাঞ্জন। কিন্তু বাইরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের সঙ্গী বৃদ্ধ লামা যেন ভোজবাজির মতো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। নীলাঞ্জন শুনতে পেল, মনাস্ট্রির ভিতর থেকে দুমদাম শব্দে ছুটে আসছে অনেক পায়ের শব্দ। কোন দিকে গেলে তারা প্রাণে বাঁচবে, বুঝতে না পেরে শুভমকে নিয়ে নীলাঞ্জন দৌড়োল সেই খাদের দিকটায়, যেখান দিয়ে সে বৃদ্ধ লামার সঙ্গে উপরে উঠে এসেছিল। তারা দৌড় শুরু করার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কৃষ্ণলামা ও তাঁর অনুচররা বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর নীলাঞ্জনদের দেখতে পেয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। খাদের কাছে এসে লামাদের দল যখন নীলাঞ্জনদের প্রায় ধরে ফেলেছেন, ঠিক তখনই নীলাঞ্জনের মনে হল, তার পিছনে পায়ের শব্দ হঠাৎই যেন থেমে গেল। নীলাঞ্জন পিছনে তাকিয়ে দেখল, কৃষ্ণলামা আর তাঁর সঙ্গী লামারা পাথরের মতো স্থির হয়ে তাদের চেয়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আর তাঁদের দৃষ্টি নীলাঞ্জনদের দিকে নয়, তাঁরা কোনাকুনিভাবে তাকিয়ে আছেন খাদের দিকে।

তাঁদের দৃষ্টি অনুসরণ করে নীলাঞ্জন দেখল, সেদিক থেকে এগিয়ে আসছেন দু'জন মানুষ। তাঁরা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন কৃষ্ণলামার দলবল আর নীলাঞ্জনদের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায়। দু'জনের মধ্যে যে মানুষটি বেশি লম্বা তাঁর হাতে একটা মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় দু'জনকেই চিনতে পারল নীলাঞ্জন। লম্বা মানুষটি হলেন সেই বৃদ্ধ লামা, আর-একজন হলেন তাঁর সঙ্গী সেই ছোট লামাটি! কিন্তু এখন তার গায়ে পা পর্যন্ত ঢাকা ঝলমলে পোশাক, মাথায় হলুদ রঙের অদ্ভুত দেখতে কান-উঁচু টুপি, হাতে ধরা আছে জপযন্ত্রটা। এই পোশাকে তাকে এর আগে দেখেনি নীলাঞ্জনরা। সারা শরীর তার মশালের আলোয় ঝকমক করছে। তারা এসে দাঁড়ানোর পর বৃদ্ধ লামা মশালটা একটু উপরে তুলে ধরলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে ছোট লামাটিও তার হাতের জপযন্ত্রটা মশালের কাছে নিয়ে গিয়ে, সেটা কৃষ্ণলামার সঙ্গীদের দেখিয়ে কী যেন বলল। তারপর জপযন্ত্রটা মাথার উপর তুলে ঘোরাতে শুরু করল। নীলাঞ্জন দেখল, কৃষ্ণলামার সঙ্গীদের চোখ-মুখের ভাবের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। তাঁদের চোখের আগুন নিভে আসছে, ধারালো অস্ত্রধরা হাতগুলো আস্তে-আস্তে শিথিল হয়ে নেমে আসছে নীচের দিকে।

তারপর হঠাৎই তাঁরা এক সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন ঝলমলে পোশাক পরা ছোট লামাটির সামনে। কৃষ্ণলামা শুধু বসলেন না। জপযন্ত্রটা হাতে ধরে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। এসব দেখার পর নীলাঞ্জনও ভুলে গেল পালানোর কথা। শুভমকে নিয়ে সে-ও দেখতে লাগল ঘটনাটা। লামার দল মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন আর ছেলেটি জপযন্ত্রটা ঘুরিয়ে চলল। হঠাৎ সে জপযন্ত্রটা ঘোরানো বন্ধ করে উচ্চৈঃস্বরে কী একটা নির্দেশ দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে তার সামনে নতজানু হয়ে বসে থাকা লামার দল অস্ত্র হাতে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোতে থাকলেন কৃষ্ণলামার দিকে।

কৃষ্ণলামা এবার তাঁর হাতের জপযন্ত্রটা উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে কী যেন বললেন তাদের উদ্দেশে। কিন্তু তাতে তাঁরা থামলেন না। প্রথমে কৃষ্ণলামা দু' পা পিছিয়ে গেলেন, তারপর উলটো দিকে ঘুরে মনাস্ট্রির উদ্দেশে দৌড়তে শুরু করলেন। আর তাঁকে তাড়া করতে শুরু করলেন লামার দল। তাঁদের পিছন-পিছন চললেন বৃদ্ধ লামা, আর তাঁর সঙ্গী ছোট লামাটিও। নীলাঞ্জনের ভয় ততক্ষণে অনেকটাই কেটে গিয়েছে। সে বুঝতে পারল, কৃষ্ণলামার কথা তা হলে কিছুটা হলেও সত্যি ছিল! বৃদ্ধ লামার সঙ্গী ছেলেটি হল শ্রোঙচেন পাউয়ের ছেলে। সে এসেছে এই মঠের উপর নিজের অধিকার ফিরে পেতে। কৃষ্ণলামা নন, এই ছোট ছেলেটিই আজ থেকে এখানকার মঠাধ্যক্ষ। আর সেটা বুঝতে পেরেই লামার দল কৃষ্ণলামার পরিবর্তে তার নির্দেশ মানতে শুরু করেছেন।

মনাস্ট্রির কাছে পৌঁছে ভিতরে ঢোকার আগে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কৃষ্ণলামা। হয়তো তিনি ভাবলেন, মনাস্ট্রির ভিতর ঢুকলে তাঁর পক্ষে বাঁচা আরও কঠিন হবে। কিন্তু কোন দিকে পালাবেন তিনি? চার দিক থেকে ততক্ষণে তাঁর কাছাকাছি চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসছেন অস্ত্র হাতে লামার দল। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল মনাস্ট্রির ছাদের দিকে। প্রবেশতোরণের ঠিক মাথার উপর বামনলামার পোষা বাঁদরটা এতক্ষণ বসে-বসে সব দেখছিল। কিন্তু চার পাশে লোকজনকে ছুটে আসতে দেখে সে বেচারা ভয় পেয়ে তখন উপর দিকে উঠতে শুরু করেছে।

তাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য একটা বুদ্ধি খেলে গেল কৃষ্ণলামার মাথায়। তিনিও মুহূর্তের মধ্যে তাঁর হাতের জপযন্ত্রটা দাঁতে চেপে ধরে তরতর করে কাঠের স্তম্ভ বেয়ে উপর দিকে উঠতে শুরু করলেন।

লামার দল ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছেন মনাস্ট্রির সামনে। কিন্তু তাঁরা এবার কী করবেন বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলেন উপর দিকে। আর কৃষ্ণলামা অসাধারণ দক্ষতায় উঠে যেতে লাগলেন এক ছাদ থেকে আর-এক ছাদে, আরও উপরের দিকে। হঠাৎ ছোট লামাটিও তার জপযন্ত্রটা কোমরে গুঁজে নিয়ে থাম বেয়ে ছাদের দিকে উঠতে শুরু করল। শুভমকে নিয়ে নীলাঞ্জনও পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। রুদ্ধশ্বাসে তারা দেখতে লাগল ঘটনাটা।

প্যাগোডা আকৃতির মনাস্ট্রির ছাদ ধাপে-ধাপে উঠে গিয়েছে উপর দিকে। কৃষ্ণলামা এক সময় পৌঁছে গেলেন তার চুড়োয়। সে জায়গাটা প্রায় পাঁচ তলা বাড়ির মতো উঁচু হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছেলেটিও পৌঁছে গেল কৃষ্ণলামা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তার ঠিক নীচের ধাপটায়। ঢালু ছাদ বেয়ে ছেলেটি কৃষ্ণলামার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তিনি উপর থেকে ছাদের আলগা হয়ে যাওয়া কাঠের টুকরোগুলো ছুড়ে মারতে লাগলেন। ছেলেটা কোনওরকমে এড়িয়ে যেতে লাগল আঘাতগুলো। এমনিতেই ঢালু ছাদের উপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। নীলাঞ্জনের মনে হতে লাগল, এই বুঝি সে উপর থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাবে। তা হলে আর সে বাঁচবে না।

শেষ পর্যন্ত হয়তো কৃষ্ণলামার আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্যই একটা শেষ চেষ্টা করল ছেলেটি। সে কোমর থেকে তার জপযন্ত্রটা খুলে নিয়ে সজোরে ছুড়ে মারল কৃষ্ণলামার দিকে। কিন্তু কৃষ্ণলামা অদ্ভুত কৌশলে ধরে ফেললেন সেটা। তারপর দু' হাতে দু'টো জপযন্ত্র নিয়ে অট্টহাস্য করে উঠলেন। তাঁর সেই ভয়ংকর হাসি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড় থেকে পাহাড়ে। জপযন্ত্র দু'টো মাথার উপরে ঘোরাতে-ঘোরাতে কী যেন বলতে লাগলেন।

নীলাঞ্জন দেখল, লামার দল অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কৃষ্ণলামার দিকে। এমনকী, ছোট ছেলেটিও ছাদের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণলামার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎই নীলাঞ্জনের মনে পড়ে গেল কৃষ্ণলামার সেই কথাটা। তার তান্ত্রিক গুরু এই মন্ত্রপূত জপযন্ত্রটা হাতে ধরে নাকি উড়ে বেড়াতেন আকাশে। তা হলে কৃষ্ণলামাও কি এবার আকাশে উড়ে যাবেন নাকি!

কথাটা ভাবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নীলাঞ্জন চাঁদের আলোয় দেখতে পেল, কৃষ্ণলামা তাঁর জপযন্ত্র ধরা হাত দু'টোকে দু' পাশে মেলে দিলেন পাখির ডানার মতো। তারপর যেন উপর দিকে একটু লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি আর উপর দিকে উঠতে পারলেন না, শূন্যে একটা পাক খেয়ে নীলাঞ্জনদের মাথার উপর দিয়ে নেমে এসে দড়াম করে আছড়ে পড়লেন মনাস্ট্রির সামনের পাথুরে মাটিতে। মুহূর্তের জন্য একবার কেঁপে উঠল তাঁর শরীরটা, তারপর চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেল। জপযন্ত্র দু'টো কিন্তু তাঁর দু' হাতে তখনও শক্ত করে ধরা।

কৃষ্ণলামার দেহ যেখানে পড়েছিল, তার চার পাশ ভেসে যাচ্ছিল রক্তে। ছাদ থেকে নীচে নেমে আসার পর ছেলেটি ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল সেদিকে। তারপর কৃষ্ণলামার হাত থেকে খুলে নিল জপযন্ত্র দু'টো। লামাদের সঙ্গে-সঙ্গে নীলাঞ্জন আর শুভমও গিয়ে দাঁড়াল তার কাছাকাছি। লামাদের উদ্দেশে ছেলেটি তাদের নিজস্ব ভাষায় কী যেন বলতে শুরু করল। আর, লামারা তাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরে শুনতে লাগলেন তার কথা। এক সময় তার বলা শেষ হল। লামাদের দল মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালেন তাকে। ছেলেটি এবার নীলাঞ্জনদের তার সঙ্গে আসার জন্য ইশারা করে হাঁটতে শুরু করল মনাস্ট্রির চত্বরের বাইরের দিকে।

সেই বৃদ্ধ লামাও মশাল হাতে চলতে লাগলেন তার পাশাপাশি। নীলাঞ্জন শুভমকে নিয়ে তাদের অনুসরণ করল। চাঁদের আলোয় পাহাড়ি পথ ভেঙে আস্তে-আস্তে তাঁরা মনাস্ট্রি থেকে দূরে চলে যেতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পথ চলার পর হঠাৎ তাঁরা দেখলেন, আকাশের একটা দিক হঠাৎ লাল হয়ে গিয়েছে। আর, ওই দিকেই মনাস্ট্রি। সেদিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সকলে। নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, মনাস্ট্রিতে আগুন ধরে গিয়েছে। হয়তো বামনলামা যে প্রদীপটা ফেলে দিয়েছিলেন মেঝেয়, তা থেকেই লেগেছে আগুনটা। অথবা অন্য কোনও ভাবেও লাগতে পারে। বৃদ্ধ লামার হাতের মশালটা তখনও জ্বলছিল। সেই আলোয় নীলাঞ্জন দেখল, লাল হয়ে যাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছোট লামাটির চোখের নীচে টলটল করছে জল।

কিছুক্ষণ পর আবার তারা চলতে শুরু করল। অনেকটা পথ চড়াই-উতরাই ভেঙে এক সময় নীলাঞ্জনরা এসে পৌঁছল সেই জায়গাটায়, যেখানে গাড়ি তাদের নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছনোর পর ছোট লামাটি ঘুরে দাঁড়াল নীলাঞ্জনদের দিকে। শুভমের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শুভমের হাতে একখানা জপযন্ত্র তুলে দিল সে। শুভমের মুখে অনেকক্ষণ পর হাসি ফুটে উঠল। একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল ছোট লামার মুখেও। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের মশালের আলো হারিয়ে গেল পাহাড়ি রাস্তার আড়ালে। তখন ভোর হয়ে আসছে।

ড্রাইভার তার কথা রেখেছিল। সে সেখানে পৌঁছে গেল ঠিক সময় মতোই। যদিও নীলাঞ্জনদের সে আবার দেখতে পাবে কি না, তা নিয়ে তার ঘোর সন্দেহ ছিল। কারণ, কৃষ্ণলামা সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায়। আগে জানলে নীলাঞ্জনদের সে কখনওই এখানে আসতে দিত না। নীলাঞ্জনদের দেখতে পেয়ে সে এত খুশি হল যে, গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল নীলাঞ্জন আর শুভমকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাদের নিয়ে চলতে শুরু করল গ্যাংটকের দিকে।

শুভম গাড়িতে ওঠার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা নীলাঞ্জনকাকু, ছোট লামাটি আমাকে পাথর ছুড়েছিল কেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে নীলাঞ্জনের মনে পড়ল খাদের নীচে সেই বাড়িটায় হাত-পা বাঁধা ছোট ছেলেটির মাথা ফাটানোর ঘটনাটাও। সে উত্তর দিল, "জানো তো, কারও শরীরে কোনও খুঁত থাকলে তাকে বলি দেওয়া যায় না। তোমার মাথা ফাটিয়ে কৃষ্ণলামার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল ছোট লামাটি।"

শুভম শুধু বলল, "হুঁ।" তারপর সে হাতের জপযন্ত্রটা ঘোরাতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ি একটা বাঁক নিতেই নীলাঞ্জন দেখতে পেল, নীচে ভোরের আলোয় ঝলমল করছে গ্যাংটক শহর।

ভ্যাকুয়াম ক্লাবের দুর্গ-প্যান্ডেল

দেবাশিস মিত্র

আজ সরস্বতী পুজো। রাত আটটা বাজে। বটতলায় আমাদের প্যান্ডেলের সামনে বক্স বাজছে। লাল-নীল টুনি বাল্ব জ্বলছে। ভিড়ও মন্দ হচ্ছে না। এবার আমাদের দুর্গ-প্যান্ডেলের থিম-পুজো পাবলিক ভালই খেয়েছে।

কিন্তু আমাদের মাথায় হাত। থিম-পুজোর গুঁতোয় আমাদের মাথায় আলু গজিয়ে গিয়েছে। পুজোর বাজেট অলরেডি দুই ছাড়িয়ে তিন হাজার ছুঁইছুঁই করছে। যেভাবেই হোক, হাজার টাকা তুলতে হবে। নইলে পাওনাদারের ঠেলায় বটতলার আড্ডাখানা তুলে দিতে হবে।

যত নষ্টের গোড়া ওই দুর্গ-প্যান্ডেল। আমাদের পাড়ার সর্বজ্ঞ বেঁটেদা দুর্গের থিমটা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে। মায় পঙ্কাদা পর্যন্ত চিতোর না কোথাকার দুর্গের প্যান্ডেলের আইডিয়াটা খেয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত হলটা কী! পুজোর চার দিন আগে থেকে রাত জেগে ইট অঙ্কন। সাদা পিচবোর্ডের উপর হাজার-হাজার, কিংবা লাখখানেকও হতে পারে, ইট এঁকে-এঁকে হদ্দ হয়ে গিয়েছি আমরা। শুধু কি তাই! গাদাগাদা আর্ট পেপার, গুচ্ছের রং কিনে ফতুর আমরা। প্যান্ডেলের পিছনেই পাক্কা দু' হাজার বেরিয়ে গেল। এখনও লাইট, মাইক, ডেকরেটরের বাঁশ, ত্রিপলের ভাড়া, বিসর্জন, সব বাকি। তাও তো বেঁটেদার পরিকল্পনামাফিক দুর্গের চার পাশে পরিখা করে সাপ, ব্যাঙ, চ্যাং মাছ ছাড়ার প্ল্যান ছেঁটে ফেলা হয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে বোঁচকা আর ঘেঁটুর খুব ঝোঁক চেপেছিল। পঙ্কাদা দু'টোকেই দু'খানা রদ্দা ঝেড়ে দিয়েছে, "পরিখার নামগন্ধ করবি না। এখন কী করে পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচবি, তাই ভাবতে থাক।"

তাই ভাবতে বসেছি চার জন মিলে। প্যান্ডেলের পিছনের তাঁবুতে। পঙ্কাদা মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, এসব চলবে না, দু' দিনে আমার টাকা চাই।"

প্যান্ডেল দেখতে আসা লোকজনের উড়ো মন্তব্য তাঁবুর ভিতর বসেই শুনতে পাচ্ছি, "বাঃ! দারুণ প্যান্ডেল! কারা বানিয়েছে গো?"

কে যেন খ্যানখেনে গলায় বলল, "সম্রাট আকবর এই দুর্গ বানিয়েছিলেন।"

শুনতে-শুনতে পঙ্কাদা রেগে কাঁই হয়ে বলল, "দর্শকের মন ভোলাতে গিয়ে আমরা পড়েছি গাড্ডায়। অথচ চাঁদার বেলায় দ্যাখো, 'এই দু' টাকা রাখো পঙ্কা, বুঝতেই তো পারছ, কী বাজার পড়েছে! তোমাদের মতো অনেক চাঁদা-পার্টিকেই তো খুশি করতে হবে, তাই...।' " এতটা বলেই পঙ্কাদা হঠাৎ খড়ের আঁটির উপর তিড়িং করে এক লাফ মারল, "অ্যাই হয়েছে, ইউরেকা!"

"অ্যাঁ, কী হল!" আমরা আঁতকে উঠেছি তিনজন।

"পাবলিকের মাথায় চাঁটি মেরে বাকি পয়সাটা উসুল করে নিতে হবে।"

"কী করে?"

"ফা-ং-শ-ন।"

পরদিন সকাল ন'টা থেকে পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু হয়ে গেল। দেখা যাক কী হয়! আমি আর পঙ্কাদা 'চোঙদার ভবন'-এর দিকে এগিয়ে চলেছি। প্যান্ডেলে ঘেঁটু আর বোঁচকা

রয়েছে। কাল রাতে তাঁবুর ভিতর ফাংশনের লিস্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। পাড়ার কোন-কোন হোতাকে শামিল করা হবে তার পুরো ছক তৈরি হয়েছে। লিস্টে প্রথম নাম দীনবন্ধু চোঙদার। আমাদের পাড়ার একজন বিশিষ্ট ইট, বাঁশ, টালির ব্যবসায়ী। ওঁর ক্লাস ফাইভে পড়া মেয়ে পান্তু গান শেখে। এই বয়সেই ওর ওজন পঁয়ষট্টি কিলো ছাড়িয়ে গিয়েছে! তা যাক, এখন আমাদের ফাংশনে ওর প্রথম উদ্বোধন হোক। কিছু করুক।

দরজায় বেল বাজিয়ে আমি আর পঙ্কাদা মাথায় এক বস্তা টেনশন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কপাল ভাল বলতে হবে, চোঙদারবাবু বাড়িতে ছিলেন। দরজা খুলতেই পঙ্কাদা আবেগের গলায় বলল, "স্যার, আমরা পাড়ায় একটা ফাংশন করছি। তাই প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়ল।"

এটুকু শুনেই চোঙদারবাবু কেমন হকচকিয়ে গেলেন। সেই ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ফের পঙ্কাদা শুরু করল, "আপনার মেয়ে পান্তু তো দারুণ গান গায়। এখান দিয়ে যেতে-যেতে আমরা শুনি তো! ওকে স্যার কিন্তু গাইতেই হবে।"

"ও, তাই নাকি?" চোঙদারবাবুর তরমুজের মতো মুখটা আরও ফুলোফুলো হয়ে গেল। নিজেকে খুব সামলে বলে উঠলেন, "আরে, বাইরে কেন? ভিতরে এসো। পান্তু তো মাত্র বছরদুয়েক হল গান শিখছে।"

ড্রয়িং রুমে ঢুকতে-ঢুকতে পঙ্কাদা বলল, "হোক দু' বছর। প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে তাই-ই যথেষ্ট। আপনি স্যার আপত্তি করবেন না কিন্তু!"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমরা যখন বলছ, তখন নিশ্চয়ই গাইবে।"

"তা হলে স্যার, সন্ধে ছ'টার মধ্যে আমাদের প্যান্ডেলে চলে আসবেন। প্রোগ্রাম শুরু হবে পান্তুকে দিয়েই। এক ঘণ্টার আগে ওকে স্টেজ থেকে নামতে দিচ্ছি না!"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," গলে জল চোঙদারবাবু।

"কিন্তু স্যার, একটাই অসুবিধে আমাদের," পঙ্কাদার গলায় করুণ বেহালার সুর।

"কেন, অসুবিধে কোথায়?" চোঙদারবাবু একটু যেন উদ্বিগ্নই।

হাতটাত কচলে পঙ্কাদা এবার ঝেড়ে কাশে, "স্যার, টাকার একটু প্রবলেম চলছে। বুঝতেই পারছেন, লাইট, মাইক, স্টেজ, হ্যানাত্যানা। আমাদের 'ভ্যাকুয়াম ক্লাব'-এর ফান্ডের অবস্থা তো স্যার জানেন!"

একটু থমকে যান চোঙদারবাবু। জলহস্তীর মতো একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর মুখ থেকে। তারপর বলেন, "কত হলে চলে?"

"পাঁচশো হলেই চলবে স্যার, তবে...ইয়ে, মানে ছ'শো হলে মাইকটা আর-একটু ভাল কোয়ালিটির হয়।"

"বেশ, ছ'শোই পাবে।" চোঙদারবাবু প্রায় গর্জন করে ওঠেন।

কথাটা কানে যেতেই আমাদের দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। চোঙদারবাবু টাকা আনার জন্য ভিতরের ঘরে ঢুকে গেলেন। পঙ্কাদা শুধুমুধু আমার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল, "দেখলি, স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা!"

এই সময় চোঙদারবাবু ঘরে ঢুকলেন। হাতে ছ'টা কড়কড়ে একশো টাকার নোট।

নোটগুলো পকেটে ভরতে-ভরতে পঙ্কাদা বলল, "এক ঘণ্টার আগে কিন্তু কিছুতেই পান্তুকে নামানো যাবে না স্যার।"

চোঙদারবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়েই এক দৌড়ে সোজা প্যান্ডেলে। বোঁচকার হাতে ছ'শো টাকা তুলে দিয়ে পঙ্কাদা বলল, "খেলা জমে গিয়েছে, বোঁচকা। তুই আর ঘেঁটু চট করে মাইকম্যান বাপিকে একবার খবর দিয়ে আয়। সাউন্ড বক্সটা যেন জব্বর হয়। চল পল্টু, এবার 'ডুপ্লিকেট হেমন্ত' মনা হালদারের বাড়ি।"

দু' জনে ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছি। একবার মগজে উৎসাহ ঢুকলে বাঙালিকে পায় কে! বছরদু'য়েক আগে মনাবাবু কলকাতায় গিয়ে নিজের গাঁটের কড়ি গচ্চা দিয়ে গানের ক্যাসেট বের করেছিলেন। ওঁর বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ গেলেই, তাকে ঘরে টেনে নিয়ে সেই ক্যাসেটের গান শোনাতেন। সেই ভয়ে আমরা ওঁর 'সুরগুঞ্জনিকা' বাড়িটার সামনে দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছি।

কিন্তু, আজকের ব্যাপারটা অন্যরকম! আমরা যেচে মনাবাবুর বাড়িতে যাচ্ছি। বাড়িতেই রয়েছেন উনি। বারান্দায় বসে খবরের কাগজ ওলটাচ্ছেন। এ সময়ে আমাদের দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। তার উপর পঙ্কাদার প্রথম কথায় আরও ঘাবড়ে গেলেন মনে হল।

"কলকাতার লোক আপনাকে হেনস্থা করতে পারে। কিন্তু স্যার, তাই বলে এই সবুজপুরের লোকজন কি আপনাকে সম্মান করে না?"

"তার মানে!" মনাবাবুর চশমা নাকের নীচে ঝুলে পড়ল।

"মানে, কলকাতায় আপনি কুড়ি হাজার খরচ করে পেয়েছেন শুধু হেনস্থা, কিন্তু স্যার, আমরা চাই অন্তত সবুজপুরের পাবলিক জানুক, ডুপ্লিকেট হেমন্ত হিসেবে আপনি কতটা সফল। তাই আজ বিকেলে আমাদের ভ্যাকুয়াম ক্লাবের ফাংশনে, আপনি গান গেয়ে মাতিয়ে দেবেন দর্শকদের।"

"আবার গান!" প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন মনাবাবু, "না পঙ্কা, যা দাগা খেয়েছি, আর গান নয়। ও লাইন ছেড়ে দিয়েছি।"

"কিন্তু স্যার, একবার ভেবে দেখুন!" পঙ্কাদা তোড়ে বলতে আরম্ভ করে, "ব্যাঙ্কের অফিসার বলে আপনাকে ক'জন চেনে এই সবুজপুরে? আর ক' জনকেই বা আপনি ধরে-ধরে ক্যাসেট শোনাবেন! তার চেয়ে আপনি সরাসরি স্টেজে উঠে গান গেয়ে অন্তত সবুজপুরের মানুষদের বুঝিয়ে দিন আপনার প্রতিভা।"

"আর কি পারব আমি!" উদাস গলায় বললেন মনাবাবু।

"পারবেন স্যার, পারতেই হবে। শুধু দুপুরটা একটু হারমোনিয়াম নিয়ে ঝালিয়ে নিন। কেবল একটাই আবেদন, শ'পাঁচেক টাকা লাগবে।"

"পাঁচশো!" উৎসাহের মই বেয়ে উঠতে-উঠতে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলেন মনাবাবু। বেজার মুখ করে বসে রইলেন চেয়ারে।

"স্যার, আপনার মতো একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে পাঁচশো টাকা আর কতটুকু! পল্টু, তুইই বল।"

আমিও সায় দিলাম, "সে তো বটেই।"

সঙ্গে-সঙ্গে পঙ্কাদা ধরল, "যা একখানা মাইক আনব না স্যার, দেখবেন! পুরো সবুজপুর কেঁপে উঠবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ই গাইছেন মনে হবে।"

পুজোয় অর্জুনের সঙ্গে দুর্ধর্ষ অভিযান

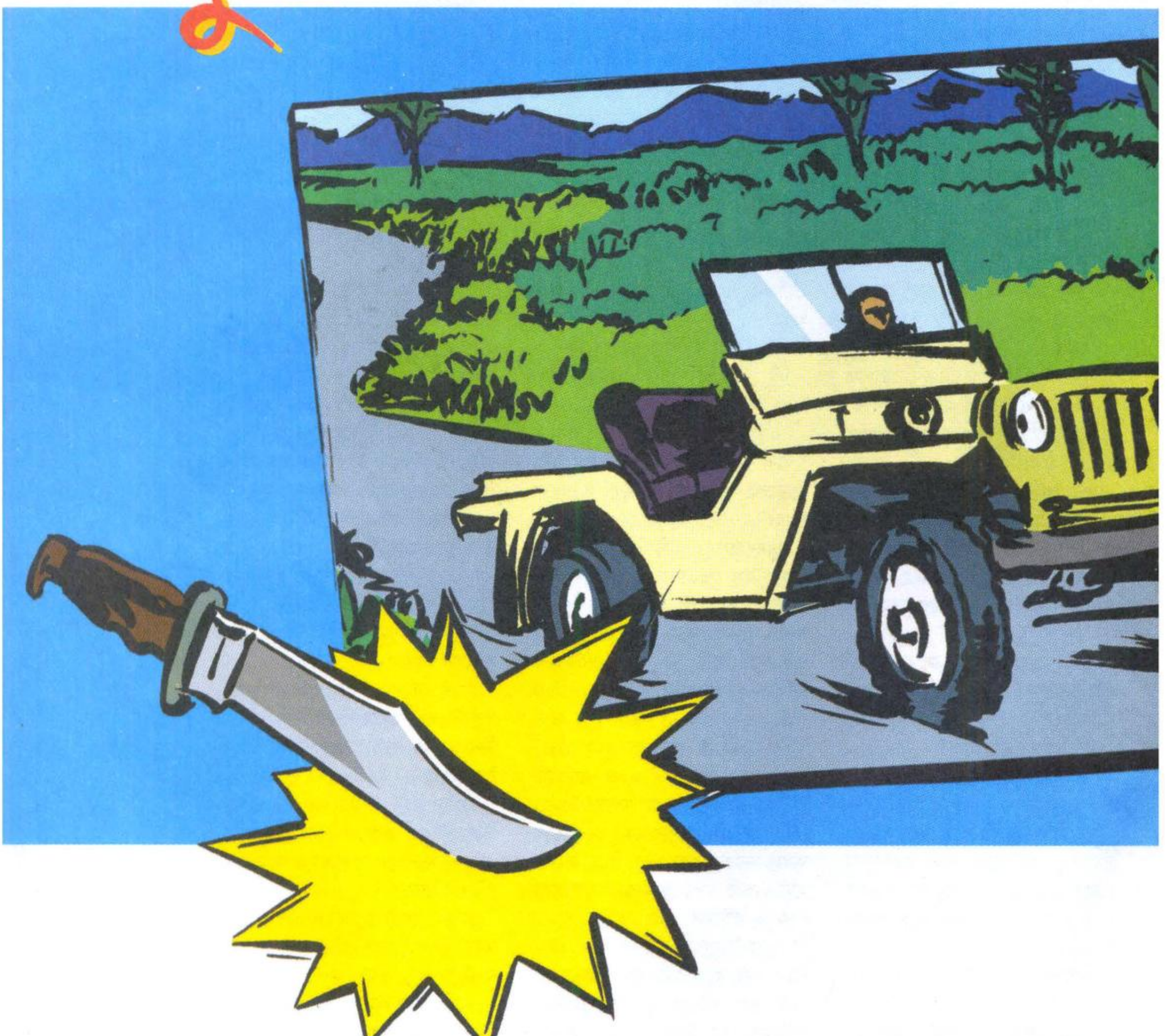

অর্জুনের রোমাঞ্চকর উপন্যাস

এছাড়াও বড়গল্প • কমিক্স • কুইজ় • ছড়া-কবিতা
জ্ঞান-বিজ্ঞান • খেলাধুলো...পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা মানেই
রহস্য-রোমাঞ্চ, আনন্দ-ফুর্তিতে ভরা জমজমাট দুনিয়া।

পূজাবার্ষিকী ১৪১৩

৭৫

আনন্দমেলা

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী।

তবু মনাবাবুর চুপসনো মুখ আর দোনামনা ভাব দেখে মনে হল, চিঁড়ে পুরো ভেজেনি।

মরিয়া পঙ্কাদা বলে ওঠে, "ভেবে দেখুন স্যার। কাল যখন রাস্তায় বেরোবেন, পাবলিকের কাছে আপনার ইমেজটা কী হবে বুঝতে পারছেন?"

শেষে অনেক ভেবেচিন্তে মনাবাবু একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে দিলেন। এর পর ঝড়ের গতিতে ছুটলাম পাড়ার গানের স্কুল, আবৃত্তির স্কুলে। কুচোকাঁচাদের নাম লিস্টে ঢুকিয়ে কুড়ি, পঁচিশ, পঞ্চাশ, যা পাওয়া গেল, সব মিলিয়ে আরও শ'চারেক হল। অবশ্য কয়েকটা জায়গায় ইনডাইরেক্ট ঘাড়ধাক্কাও খেতে হল। তবে, সব মিলিয়ে ব্যবসা মন্দ হয়নি। হাজার দেড়েক উঠেছে।

হলে কী হবে, পঙ্কাদার মুখের পাঁচন খাওয়া ভাব মোটেই কাটেনি। ঘুরতে-ঘুরতে এক সময় আমাকে বলল, "বুঝলি পল্টু, সকলকে যা ডায়লগ দিয়েছি, হাজার খানেকের কমে লাইট, মাইক, স্টেজ হবে না। আরও শ'পাঁচেক জোগাড় করতে পারলে..."

এমন সময় একটা ডাক শোনা গেল, "এই যে পঙ্কা, এত ব্যস্ত হয়ে চললে কোথায়?"

তাকিয়ে দেখলাম, দেবেনবাবু বাগানে খুরপি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একা মানুষ, বেশ হাসিখুশি, দিলদরিয়া। পঙ্কাদা ডাক শুনে দাঁড়িয়ে বলল, "আর বলবেন না। সবুজপুরের কী অবস্থা! পাড়ায় একটা ফাংশন করব, সকাল থেকে ঘুরেও একখানা ভাল গাইয়ে পেলাম না!"

"তাই নাকি! তা হলে তো তুমি একেবারে ঠিক জায়গায় এসে পড়েছ। আর চিন্তা নেই তোমাদের।"

"তার মানে!" আমি আর পঙ্কাদা চমকে যাই।

"আমার বাড়িতে এখন কে বসে আছেন জানো?"

"কে?"

"পীতাম্বর ভট্টাচার্য, আমার মামাশ্বশুর। প্রচুর মেডেল পেয়েছেন গান গেয়ে।"

গান গেয়ে মেডেল! শুনেই কেমন খটকা লাগছিল। কিন্তু নতুন খাবারের গন্ধে খটকা ভুলে ততক্ষণে আমরা গেট খুলে ভিতরে ঢুকে পড়েছি। দারুণ একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে দেবেনবাবু আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন।

ড্রয়িং রুমে শৌখিন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা জব্বর গোঁফওয়ালা জাঁদরেল ভদ্রলোকই যে পীতাম্বর ভট্টাচার্য, সেটা ঢুকেই বুঝে গেলাম। গদি আঁটা চেয়ারে বসে মেজাজে টিভি দেখছিলেন। এদিকে দেবেনবাবুর হাসির বিরাম নেই। আমাদের নিয়ে সোজা ওঁর সামনে হাজির।

"হেঁ হেঁ, বুঝলেন, ছোকরাগুলো বিশ্বাসই করছে না আপনি গান গেয়ে পঁচিশটা মেডেল পেয়েছেন।"

"অ্যাঁ! বিশ্বাস হচ্ছে না!" সিংহনাদ করে ওঠেন পীতাম্বরবাবু। তারপর হঠাৎই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘরের কোণ থেকে লটবহর হাতড়ে গোটাকতক রংচটা গোলাকার বস্তু আমাদের চোখের সামনে দোলাতে লাগলেন।

পঙ্কাদা একটু করুণ স্বরে বলল, "আমরা আবার কখন বললাম বিশ্বাস করছি না। আমরা তো শুধু ভাল গাইয়ে খুঁজছিলাম। মানে, আমাদের পাড়ায় আজ দারুণ ফাংশন, তাই স্যার আপনার গান..."

"আমার গান!" ফের সিংহনাদ করে ওঠেন ভদ্রলোক। তারপর হা হা করে দারুণ একখানা যাত্রামার্কা অট্টহাসি ছেড়ে বললেন, "হেড়মপুর থেকে শুরু করে জব্বলপুর রাজবাড়ি পর্যন্ত এই শর্মা কালোয়াতি গান গেয়ে এসেছে। সেসব বাড়ির বিশাল জলসাঘরে এই গমগমে গলার খেল দেখিয়ে এসেছি। তোমাদের এই পুঁচকে ফাংশনে এসব গান খেলবে কোথায়!"

আমার কিন্তু প্রথম থেকেই পুরো ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে। কিন্তু পঙ্কাদা হাল ছাড়েনি। ফস করে বলে দিল, "মাইক, স্যার, মাইক। চার কোণে এমন চারটে চোঙ ফিট করে দেব না, আপনার কালোয়াতি গান সবুজপুর ছাড়িয়ে সিদিকপুর, কেতুপুর পৌঁছে যাবে।"

"মাইক!" একটু যেন নড়েচড়ে বসেন পীতাম্বরবাবু। পঙ্কাদা তখনও বলেই চলেছে, "চারখানা মাইকে ফাটাফাটি প্রোগ্রাম হয়ে যাবে। শুধু স্যার, চোঙের ভাড়াটা, মাত্র পাঁচশো টাকা হলেই চলবে।"

উপযাচক হয়ে দেবেনবাবু বলে ওঠেন, "টাকার জন্য ভেবো না পঙ্কা, শুধু উনি রাজি হন কিনা দ্যাখো। খাঁটি ক্লাসিক্যাল গান কিনা, এসব এখানকার লোক শোনেইনি।"

ওদিকে পীতাম্বরবাবু দেখি আমাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। তারপর হঠাৎই বলে উঠলেন, "চারটে চোঙ থাকলে রাজি।"

এর পরের ঘটনা সংক্ষেপে বলি। পাঁচশো টাকা পকেটস্থ করে আমি আর পঙ্কাদা উর্ধ্বশ্বাসে চললাম প্যান্ডেলে। সারা দুপুর টইটই করে বেড়াচ্ছি। লাইট, মাইক, স্টেজ, সব ম্যানেজ করা কি সোজা কথা নাকি! এদিকে পঙ্কাদা দুপুরে বেঁটেদাকে বাড়ি থেকে শীতঘুম ছাড়িয়ে টেনে এনেছে। আমাদের গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়ার মজা এবার দেখাচ্ছি! ঠিক হল, বেঁটেদাকে অনুষ্ঠান সঞ্চালকের ভূমিকায় নামানো হবে।

সারা বিকেল ঘেঁটু আর বোঁচকা ফাংশনের প্রচার করে বেড়াল। সকলেই জেনে গিয়েছে ব্যাপারটা। সন্ধে নামতেই গুটিগুটি লোক আসতে শুরু করেছে প্যান্ডেলের সামনে। বিশেষ করে যারা কবিতা, গানে অংশ নেবে, তারা তো বটেই।

স্টেজের সামনে ফোল্ডিং চেয়ার বেশ কিছু সিরিয়াস অভিভাবক অলরেডি দখল করে বসে পড়েছেন। মাইকম্যান বাপি বেশ বড়সড় একখানা লাল-নীল আলো জ্বলা মেশিনের সামনে বসে খুটখাট করে কী সব সুইচ দেখে নিচ্ছে। চেয়ারের সারির পিছন দিকে পাড়ার যুবক আর কচিকাঁচার হাল্কা ভিড় জমে উঠেছে। ফাংশন শুরু করার জন্য একেবারে আদর্শ পরিবেশ।

এমন সময় একখানা ঝকঝকে মারুতি এসে দাঁড়াল স্টেজের পাশে। মচাৎ করে গাড়ির গেট খুলে নেমে এলেন চোঙদার ফ্যামিলি। চোঙদারবাবু আর ওঁর স্ত্রী একেবারে সামনের চেয়ারে কোলাব্যাঙের মতো কোনওমতে থুবড়ে বসেছেন। পঙ্কাদা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। ওদিকে বেঁটেদা মাইক্রোফোনে জোরদার বক্তৃতা দিচ্ছে। চোঙদারবাবুর মেয়ে পান্তু স্টেজ কাঁপিয়ে মাইকের সামনে জাঁকিয়ে বসে গেল। এক ঘণ্টার আগে ওকে কিছুতেই নামানো যাবে না। শুরু হল

গান।

উরে বাবা! সে কী গান! পঙ্কাদার মুখটা সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি। চোখনাক কুঁচকে পাঁচন খাওয়া মুখে দাঁড়িয়ে আছে! পুরো কোকিল আর কাকের পাঞ্চিং গলা পান্তুর। হারমোনিয়ামের তীব্র প্যাঁপোর-পোঁ আর পান্তুর গলা, দুইয়ে মিলে যেন দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। বাপি এলোপাথাড়ি মেশিনের সুইচ টিপে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক যেতে না-যেতেই সামনের চেয়ারের দর্শকদের ভিতর কেমন আনচান ভাব। পঙ্কাদা আমার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, "পল্টু, গতিক কী বুঝছিস?"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "একদম খারাপ, এরকম গান আর বেশিক্ষণ চললে পাবলিককে ঠেকানো মুশকিল হবে।"

পঙ্কাদা খুব চিন্তিত হয়ে বলল, "চেয়ারের লোকদের যেভাবে হোক আটকাতেই হবে। পল্টু, ঝটপট নবর দোকান থেকে গোটাতিরিশেক শিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে আয়। সঙ্গে নিমকি বিস্কুটও দু' প্যাকেট আনিস।"

আমার ডান দিকের কোণের চেয়ার থেকে ঘোষবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন, "আমার মাথাটা ঘুরছে কেন! না, একটু হাওয়া খেয়ে আসতে হচ্ছে!" স্বগতোক্তি করে ঘোষবাবু কেটে পড়তে চাইলেন।

পঙ্কাদা তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে বলল, "বসুন স্যার, একটু জলখাবারের ব্যবস্থা আছে। গরম শিঙাড়া আর চা আসছে।"

"তাই নাকি?"

"আজ্ঞে, সামান্য ব্যবস্থা, মানে..."

পঙ্কাদার কথা আর না শুনে আমি দৌড়লাম নবর দোকানে।

চা-শিঙাড়া আর বিস্কুট বিলিয়ে চেয়ারে বসা জনা কুড়ি লোককে আটকানো গিয়েছে। এমন সময় জটলার ভিতর থেকে কে যেন হেঁড়ে গলায় বলল, "এই নীলু, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন বল তো?"

তাকিয়ে দেখি, পাড়ার দুই উঠতি যুবক গোপাল-নীলু। একদৃষ্টে স্টেজের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রশ্ন শুনে নীলুও খ্যানখেনে গলায় জবাব দিল, "তাই তো ভাবছি, কেন বল তো?"

গোপাল বলল, "আমি ভাবছি, তুই শুনছিস।"

"হ্যাঁ, আমি শুনছি না ছাই! এরকম হাঁড়িচাঁচার গান শুনতে আমার বয়ে গিয়েছে। চল চল, চপ-কাটলেট খাই।" বলতে-বলতে দু'জন কেটে পড়ল।

এদিকে সামনে বসা দর্শকদের অবস্থা সঙিন। চা-শিঙাড়া দিয়েও এইট্টি পার্সেন্ট লোককেই আটকানো যায়নি। গোটাদশেক লোক পঙ্কাদার দেওয়া নিমকি বিস্কুট চিবোচ্ছে। একমাত্র চোঙদারবাবু একমনে মেয়ের পারফরম্যান্স উপভোগ করছেন।

এরই মধ্যে পঙ্কাদা দেখি পিছনের কুচোকাঁচাদের হল্লা বন্ধ করতে লজেন্স বিলোচ্ছে। আর মিনিট দশেক কোনওমতে কাটাতে পারলে হয়।

পান্তুর গান শেষ হতেই বেঁটেদা মাইক নিয়ে আগডুম বাগডুম বকে ফাংশনের হাল ফেরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু যে হাল ভেঙে দিয়ে দিয়েছে পান্তু, সেই হালে নৌকো বাওয়া অত সোজা নয়। মেয়েসহ চোঙদার ফ্যামিলি মারুতি চেপে চলে যেতেই কিছু দর্শক ফিরে এল। এরপর বেঁটেদা ঝটপট যেসব ছোট ছেলেমেয়ে আবৃত্তি করবে, তাদের তুলে দিল স্টেজে। এর মধ্যে একটি কথা না বললেই নয়।

আমাদের পাড়ার হাড় কেপ্পন ভজহরিবাবুর ছেলে বিট্টু। বিট্টু আবৃত্তি করছে, 'আমাদের ছোট নদী চলে...'

ভজহরিবাবু স্টেজের এক পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে প্রম্পট করছেন, "আঁকেবাঁকে।"

বিট্টু: "বৈশাখ মাসে তার..."

ভজহরিবাবু: "হাঁটু জল থাকে।"

বিট্টু: "পার হয়ে যায় গোরু, পার হয়..."

ভজহরিবাবু: "গাড়ি।"

বিট্টুর চাকা গাড়ি পর্যন্ত গিয়ে একেবারে পুরো পাংচার হয়ে গেল। মাইক্রোফোনের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে বিট্টুর আর কোনও রা নেই। শীতের রাতেও দেখলাম, বিট্টুর কপাল দিয়ে টপাস-টপাস করে ঘাম গড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত ভজহরিবাবু বিট্টুর কাছে গিয়ে চটাস করে এক চাঁটি কষিয়ে বললেন, "তোর জন্য কড়কড়ে কুড়ি টাকা গচ্চা গেল, শেষে কিনা এইভাবে...!"

শেষে বেঁটেদা এগিয়ে এসে স্টেজ থেকে কোনওরকমে দু' জনকে নামিয়ে দিল। তারপরও আমি দেখলাম, ভজহরিবাবু বিট্টুর পিঠে দুমদাম কিল মারতে-মারতে বাড়ির দিকে নিয়ে চলেছেন। কুড়ি টাকা তাঁর কাছে বিরাট অঙ্ক। তাই বিট্টুর পিঠে উসুল করে নিচ্ছেন ভজহরিবাবু। পঙ্কাদা বুদ্ধি খাটিয়েছে বটে! ফাংশনের মহিমায় এরকম হাড় কিপটেও কুড়ি টাকা দিয়েছেন!

আবৃত্তির পালা তো উতরোল। এবার মনাবাবুর গান! দামি পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, গলায় মাফলার জড়িয়ে মনাবাবু পুরোদস্তুর গায়কের ভূমিকায় স্টেজে ওঠার জন্য হাঁকপাঁক করছেন। উনি আবার অফিস সহকর্মী খ্যাতনামা তবলচি মণিরাম সরখেলকে সঙ্গে এনেছেন।

পঙ্কাদা জিজ্ঞেস করল, "সব ঠিক আছে তো মনাবাবু?"

মনাবাবু কেমন ফ্যাঁসফেসে গলায় বললেন, "সব ঠিকই ছিল পঙ্কা। শুধু দুপুরের রেওয়াজটা যেন একটু বেশি হয়ে গেল। গলাটা কেমন চোক্‌ড হয়ে আসছে।"

"ও সব ঠিক হয়ে যাবে! মাইক্রোফোনে গলা যা খোলতাই হবে না, শুধু দেখবেন!"

স্টেজে উঠে গেলেন মনাবাবু। এদিকে বেঁটেদাও কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছে, "এইবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হবেন সেই খ্যাতনামা গায়ক। এক সময়ের কলকাতা কাঁপানো গণপতি হালদার। আপনারা কেউ যাবেন না, উনি আমাদের কথা দিয়েছেন, অন্তত এক ঘণ্টা

বাংলায় কম্পিউটারের বই
কৌশিক দত্ত ও সোমা রায়চৌধুরীর
প্রাথমিক কম্পিউটার শিক্ষা ১২৫
ওয়ার্ড ১২৫ এক্সেল ১২৫
পাওয়ারপয়েন্ট ৮০ ইন্টারনেট ৭৫
কোরেল ড্র ১২৫ পেজমেকার ৭৫
অ্যাডোব ফটোশপ ১৫০
স্কুলের পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য অবশ্যপাঠ্য বই
সহজে শেখো কম্পিউটার
(১, ২, ৩, ৪)
অঞ্জলি প্রকাশনী
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, শপ ১৬ (দোতলা)
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
ফোন : ০৯৪৩৩৪২৮০৯১/০৯৪৩৩৪২৮০১৩
E-mail: anjaliprokashani@hotmail.com / @yahoo.co.in

না গেয়ে স্টেজ ছাড়বেন না।"

এক ঘণ্টা! শুরুতেই চ্যাঁ-চ্যাঁ গলায় 'পথ হারাব বলেই' শুনে বুঝে গিয়েছি, আজ পুরো পথ হারিয়েছেন মনাবাবু। একটা অনর্থ হবেই। তার উপর হাইফাই থ্রি ডি বক্সে কাকতাড়ুয়া গলা আরও তিন গুণ ভয়ানক শোনাচ্ছে।

খুব বেশি হলে মিনিট পনেরো গান গড়িয়েছে। হঠাৎ দেখলাম, কোথা থেকে একটা পচা টম্যাটো উড়ে এসে হারমোনিয়ামে ড্রপ খেয়ে মনাবাবুর কপালে লেগে ফেটে গেল।

পঙ্কাদা আমাদের ডেকে নিয়ে বলল, "পল্টু, বোঁচকা, ঘেঁটু, পজিশন নিয়ে নে। অবশ্য তেমন বুঝলে পিটটান দিবি।"

প্যান্ডেলের ডান দিকে একটা ছাতিম গাছের আড়ালে আমরা চার জন ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তবে শেষ পর্যন্ত তেমন গুরুতর কিছু হল না। তিন নম্বর টম্যাটোটা মনাবাবুর ডান চোখের নীচে থপাস করে লাগতেই দারুণ রাগে হারমোনিয়াম, তবলা নিয়ে দুদ্দাড় করে স্টেজ থেকে নেমে গেলেন।

কোনওরকমে বেঁচে গিয়ে যা হোক স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। ওদিকে দেবেনবাবুর মামাশ্বশুর পীতাম্বরবাবু কালোয়াতি গাইতে স্টেজে ওঠার তোড়জোড় করছেন।

বেঁটেদা আবার বুলি আওড়াতে আরম্ভ করেছে, "বন্ধুগণ, এবার যিনি আপনাদের সামনে আসছেন, তাঁকে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ভারতের অন্যতম বিখ্যাত রাগসঙ্গীতশিল্পী পীতাম্বর ভট্টাচার্য। এঁর সম্বন্ধে নতুন করে কিছুই বলার নেই। ব্রিটিশ আমল থেকে এখন পর্যন্ত, তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি মেডেল পেয়েছেন। আমাদের একান্ত অনুরোধে তিনি গাইতে রাজি হয়েছেন।"

'ব্রিটিশ আমল' কথাটা শুনে অনেকেই বেশ নড়েচড়ে বসেছে। কে একজন বলল, "আমারও ব্রিটিশ আমলের সাইকেলটার কথা মনে পইড়া গেল রে নেপু। কোন হতচ্ছাড়া যে ঝাইড়া দিল, একবার বাগে পাইলে না..."

এদিকে স্টেজে ভট্চাজমশাই উঠে পড়েছেন। দশাসই চেহারা আর পাকানো গোঁফজোড়া নিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে থেবড়ে বসে গেলেন। মাইকম্যান বাপিও দেখলাম দারুণ সিরিয়াস হয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে নিয়েছে।

প্রথমে হারমোনিয়ামে দ্রুত রিড চালিয়ে একটা গৎ ভেঁজে নিলেন ভট্চাজমশাই। উত্তেজিত পঙ্কাদা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "আজ একটা মারকাটারি ফাংশন হচ্ছে।"

সত্যিই তাই। পঙ্কাদা যথার্থ বলেছে। হারমোনিয়াম ছেড়ে দিয়ে বাঘের থাবার মতো একখানা হাত শূন্যে তুলে অন্য হাতটা নিজের কানে চেপে প্রথম বুলি ছাড়লেন পীতাম্বরবাবু, "গ্যাঁও-ও-ও-!"

ওরে বাপ রে! লোকজন এক লাফে দু' হাত পিছনে। বাপি হেডফোনটোন ফেলে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"গ্যাঁও-ও-ও, ক্যাঁও-ও-ও!" একটুও ভুল বলছি না। ঠিক এরকম আওয়াজই ভেসে এল মাইক্রোফোনে।

"গোঁয়া-কোঁয়া-গ্যাঁও-ও-ও-কোঁয়া..."

মিনিটতিনেক এরকম চলার পর হঠাৎ দ্রুত লয়ে শুরু হয়ে গেল সেই ভয়ানক কালোয়াতি গান! দর্শক চটিটটি ফেলেই ভেগেছে। খানিক পরে দেখলাম, শুধু আমরা চার মক্কেল প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মাইকম্যান মেশিন ছেড়ে চেয়ারে এলিয়ে বসে আছে। আরও মিনিটপাঁচেক পরে বাপি এসে পঙ্কাদাকে বলল, "চোঙ অফ করে দেব?"

"ছেড়ে দে, চলুক। পয়সা যখন নিয়েছি, কথার খেলাপ করব না।"

আরও আধ ঘণ্টা যে কীভাবে কাটালাম কে জানে! বেশির ভাগ সময়ই অবশ্য কানে আঙুল গুঁজে আকাশের তারা গুনেছি। এমন সময় দেখি, কে একজন লাঠি হাতে এদিকেই আসছে। কাছে আসতে বুঝলাম, আমাদের রেশন দোকানের নকুড়বাবু। আমাদের ক্রস করে সোজা স্টেজের কাছে চলে গেলেন। কিন্তু পীতাম্বরবাবুর কোনও হুঁশই নেই। চোখ বুজে গাইছেন আর হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন।

পটাং পটাং! পাকানো বাঁশের লাঠিটা স্টেজে দু' বার পড়তে কাজ হল। অর্ধনিমীলিত চোখেই পীতাম্বরবাবু নকুড়বাবুকে দেখতে পেলেন। তারপর যা একখানা কাণ্ড হল না! যে মানুষ রেশন দোকানের হাজারও লোকের হাড় জ্বালানো কথা হজম করে হাসিমুখে বসে থাকেন, তাঁকে পর্যন্ত রাগিয়ে দিয়েছেন মামাশ্বশুর! গানের পাওয়ার নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

শেষে ক্ষান্ত হলেন পীতাম্বরমশাই। কারণ, ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ করেছি, মাঠের কাছে কয়েকজন লোক। কেউ খালি হাতে নয়। সঙ্গে-সঙ্গে মাইক বন্ধ। ফাংশন পুরো স্টপ।

বাপি ব্যস্ত হয়ে মাইক গোটাচ্ছে। আমরা ফোল্ডিং চেয়ার। তখনও বুঝিনি ফাংশনের পরিণতি কী! কোনওরকমে ডেকরেটরের জিনিস পৌঁছে দিয়ে টলতে-টলতে বাড়ি গিয়েই ঘুম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল জানলায় টোকার শব্দে। জানলা খুলতেই পঙ্কাদা বলল, "পল্টু, এখনই বাইরে আয় তো।"

বেরোতেই পঙ্কাদা হনহন করে হাঁটতে আরম্ভ করল। বললাম, "কী ব্যাপার বলো তো!"

পঙ্কাদা হাঁটতে-হাঁটতেই বলল, "ব্যাপার পরে শুনবি, আগে চল, ভালয়-ভালয় ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে আসি।"

ভ্যানওয়ালা কালু, আমি আর পঙ্কাদা ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে বটতলায় ফিরছি, এমন সময় দেখি, ঘেঁটু আর বোঁচকা হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই আসছে। কাছে এসেই চেঁচিয়ে উঠল দু' জন, "আচ্ছা লোক তো তোমরা, ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে দিলে!"

পঙ্কাদা বলল, "ওই দ্যাখ, কেন!"

আমরা সকলে দেখলাম, কয়েকজন প্যান্ডেলের চার পাশে ঘুরঘুর করছে। মুশকো মতো একটা লোক খুব চেঁচাচ্ছে, "না না, আমি জানতে চাই, কোন বিচ্ছুর দল কাইল রাতে ফাংশন করছিল! মশাই, আমরা কেতুপুরের মানুষ কাইল কেউ ঠিক কইরা ঘুমাইতে পারি নাই ওই আওয়াজের ঠেলায়।"

ওর পাশ থেকে লুঙ্গি পরা একজন লোকও গলা মেলাল, "আমিও জানতে চাই ছোকরাগুলো কারা!"

পঙ্কাদা চাপা গলায় বলল, "এবার বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা! কালকের চারখানা চোঙ, কেতুপুর, সিদিকপুর, নেত্যপুর, সব তোলপাড় করে দিয়েছে। কেটে পড় এখান থেকে। দু'-চারদিন বটতলা ঘেঁষিস না। আর-একটা কথা, ভুলেও কেউ যেন আমার কাছে দুর্গ-প্যান্ডেল আর ফাংশনের নাম করিস না। এই বলে দিলাম।"

ছবি: দেবাশিস দেব

কুইজ়

কুইজ়ের প্রশ্ন বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, খেলাধুলো, যে-কোনও বিষয় নিয়েই হতে পারে। তাই নানারকম বিষয় নিয়ে এবারের কুইজ়।

১ বিজ্ঞানী পিয়ের কুরি তাঁর জন্মভূমির নামানুসারে কোন রাসায়নিক মৌলের নামকরণ করেন?

২ 'টাচডাউন্স' কথাটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?

৩ নাগেশ কুকুনুর পরিচালিত 'ইকবাল' ছবিতে, ভারতের কোন প্রাক্তন বোলার নিজের চরিত্রেই অতিথি শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছিলেন?

৪ 'রামায়ণ'-এ রামের ধনুকের নাম কী ছিল?

৫ বিখ্যাত গায়ক জন লেননের 'মিডল নেম' বা মধ্য নাম কী ছিল?

৬ ১৫০৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর আমার জন্ম হয় ফ্রান্সে। লাতিন, হিব্রু, গ্রিক সহ বিভিন্ন ভাষা এবং গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলাম আমি। দশ খণ্ডে লেখা আমার ভবিষ্যদ্বাণীর নাম 'সেঞ্চুরি'। কে আমি?

৭ কোন শহরে বেড়াতে গেলে বিখ্যাত 'ব্রুকলিন সেতু' দেখা যায়?

৮ মানব শরীরের কোন অঙ্গে 'ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপ' দেখতে পাওয়া যায়?

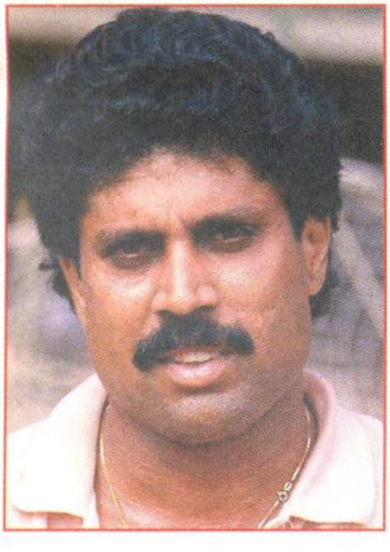

গত সংখ্যার উত্তর

১. টয় স্টোরি।
২. শাহরুখ খান।
৩. ফাইন্ডিং নিমো।
৪. আইস এজ।
৫. কোনও চিন্তা নেই।
৬. শ্রেক।
৭. রবিন উইলিয়াম্‌স।
৮. শ্রেক।

জবাব চাই

১. ক্যাসিয়াস ক্লে কোন নামে পরিচিত?
২. মানুষের শরীরের কোন অঙ্গের চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম অপথালমোলজি?
৩. এফ বি আই-এর পুরো অর্থ কী?
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. লাসা। ২. নিউ ইয়র্ক। ৩. ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।

সঠিক উত্তরদাতা

রোজিনা পারভিন, ষষ্ঠ শ্রেণি, শিবপুর হিন্দু গার্লস হাই স্কুল, হাওড়া; **সপ্তপর্ণী দে**, বড়িশা গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা; **প্রসূন নসিপুরী**, সপ্তম শ্রেণি, শীতলগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম; **অপরূপ আইচ**, একাদশ শ্রেণি, রিষড়া বাণীভারতী, হুগলি; **স্বর্ণজিৎ অধিকারী**, দশম শ্রেণি, নিউ আলিপুর বহুমুখী বিদ্যালয়, কলকাতা; **অভীক বিশ্বাস**, অষ্টম শ্রেণি, কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন, কাটোয়া, বর্ধমান; **শুভম ঘোষ**, পঞ্চম শ্রেণি, ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনস্টিটিউশন, কলকাতা; **অনীক নন্দী**, অষ্টম শ্রেণি, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা; **স্বাধীনা কোলে**, দশম শ্রেণি, শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি; **মীজানুর রহিম**, দশম শ্রেণি, সি এম এস উচ্চ বিদ্যালয়, বর্ধমান; **শমীক দত্ত**, পঞ্চম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়; **সৌম্য গায়েন**, নবম শ্রেণি, বিডি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, প্রতাপগড়, কলকাতা; **সব্যসাচী রায়**, সপ্তম শ্রেণি, ডি পি এস ফরাক্কা, মালদহ; **সুতপা হালদার**, অষ্টম শ্রেণি, **জীবন দাস**, নবম শ্রেণি, গঙ্গারামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর; **সুজন ঘোড়ুই**, দ্বাদশ

শ্রেণি, বাঙ্গালপুর ইউ সি হাই স্কুল, হাওড়া; **অয়ন ওঝা**, অষ্টম শ্রেণি, পাঠভবন শান্তিনিকেতন, বীরভূম; **শুভেন্দু গায়েন**, দ্বাদশ শ্রেণি, চালুয়াড়ি মশাট হাই স্কুল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; **শিল্পা দাস**, একাদশ শ্রেণি, ওয়েলল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা; **দেবমাল্য ধর**, সপ্তম শ্রেণি, ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি, কালচিনি, জলপাইগুড়ি; **সুচিত্রা দাস**, নবম শ্রেণি, গঙ্গারামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর; **সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়** (ই-মেল মারফত); **দীপন পুষিলাল**, দশম শ্রেণি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনস্টিটিউশন; **দীপাঞ্জন দত্ত**, অষ্টম শ্রেণি, বাদুড়িয়া দিলীপকুমার স্কুল,উত্তর ২৪ পরগনা।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো

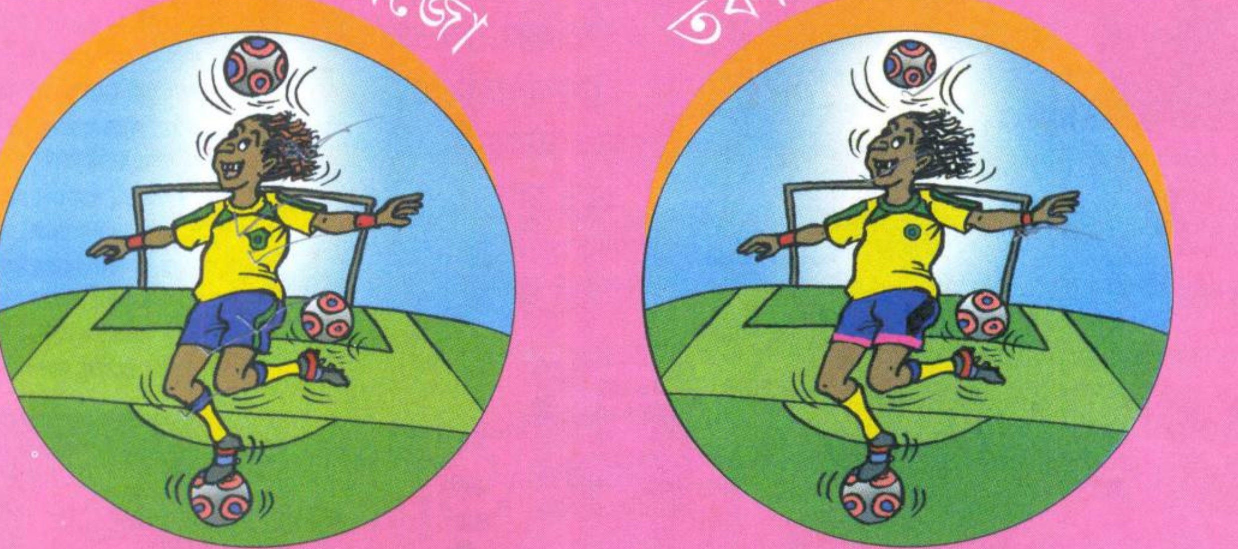

উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

রোহিত আর রাহুল দুই ভাইয়ের জ্বালাতনে পাড়ার সকলে অতিষ্ঠ। প্রতিদিন তাদের বাবা-মা'র কাছে তাদের মারপিটের নালিশ জানিয়ে অভিযোগ আসে। বকাঝকা-আদর-অভিমান সব রকম চেষ্টা করে দেখলেন তাঁরা। কিন্তু কিছুতেই কোনও লাভ হল না। শেষে তাঁরা তাঁদের চেনা এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি আগে ছোট ছেলেটিকে ঘরে ডেকে বোঝালেন সকলের মধ্যে, এমনকী সব জিনিসের মধ্যেও ভগবান আছে, তাই কাউকে আঘাত করা উচিত নয়। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ভগবান কোথায় আছেন?"
ছেলেটি কোনও উত্তর দিল না। তিনি আরও দু'-তিনবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পেলেন না। তখন রেগে গিয়ে তিনি বললেন, "শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি বলো, ভগবান কোথায় আছেন?"
ছেলেটি এবার এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার দাদাকে বলল, "দাদা, চল এখান থেকে পালাই। এই ভদ্রলোক ভেবেছেন আমরা ভগবানকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু তা তো আমরা করিনি?"

শিক্ষিকা: তোমার বাবা কী করেন?
অতনু: আমার বাবা ম্যাজিক দেখান।
শিক্ষিকা: তাই নাকি! তাঁর জনপ্রিয় খেলা কোনটি?
অতনু: মানুষ কেটে দু' ভাগ করা।
শিক্ষিকা: বাঃ! তোমরা ক' ভাইবোন?
অতনু: তিন। আমি ছাড়া একজন অর্ধেক ভাই, আর-একজন অর্ধেক বোন।
শিক্ষিকা: মানে?
অতনু: বাবা কালকের শোয়ে ভুল জোড়া লাগিয়ে ফেলেছেন। আজকের শোয়ে আবার ঠিক করে দেবেন।

রিম্পি: মা, আজ স্কুলে এমন একটা কাজের জন্য শাস্তি পেয়েছি যেটা আমি করিনি।
রিম্পির মা: এটা খুবই অন্যায়! আমি কালকেই গিয়ে তোমার শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলব। দরকার হলে প্রধানশিক্ষিকার সঙ্গেও দেখা করব। কাজটা কী, যা তুমি না করেও শাস্তি পেয়েছ?
রিম্পি: আমি হোমওয়ার্ক করিনি বলে শাস্তি পেয়েছি।

একদিন সন্ধেবেলা রমেশের বাবা বাড়ি ফিরে দেখলেন রমেশ তাদের পোষা কুকুরের উপর বসে স্কুলের কাজ করছে।
রমেশের বাবা: এ কী! তুমি ভুলুর উপর বসে লিখছ কেন?
রমেশ: কী করব? স্কুলে দিদিমণি বলেছেন বাড়িতে কোনও পোষ্য থাকলে তার উপর রচনা লিখে নিয়ে যেতে।

প্রথমদিন স্কুল থেকে আসার পর মারিয়া বলল, "আমি কাল থেকে স্কুলে যাব না।" মা কারণ জিজ্ঞেস করলে, সে বলল, "আমি লিখতে পারি না, পড়তেও পারি না, আর ওঁরা আমাকে কথা বলতে দেন না।"

অর্থ শেখো

বই যত বেশি পড়া যাবে, ততই নতুন-নতুন শব্দ আয়ত্ত হবে। শুধু ইশকুলের পাঠ্য বই নয়, পড়তে হবে প্রচুর গল্পের বইও। বই পড়তে-পড়তে নতুন শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে তার অর্থও জানা যাবে। নীচের শব্দগুলোর পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটা ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দিতে হবে। তারপর উত্তর মিলিয়ে দেখে নিতে হবে।

ধূর্জটি: (১) চন্দ্র, (২) জটাধারী, (৩) শিব, (৪) ধূম্রলোচন।

মেহনত: (১) স্বাবলম্বন, (২) পরিশ্রম, (৩) মেহমান, (৪) খাটুনি।

অনাহূত: (১) যে আহত হয়নি, (২) যে আসেনি, (৩) যাকে ডাকা হয়নি, (৪) অনাদৃত।

বীতরাগ: (১) যার বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা নেই, (২) যার ক্রোধ নেই, (৩) রাগারাগি যে পচন্দ করে না, (৪) যার সঙ্গীতে রাগরাগিণীর জ্ঞান নেই ।

ফিরিস্তি: (১) ফিরতি, (২) যা ফিরে আসবে, (৩) তালিকা, (৪) ফেরারি।

গত সংখ্যার উত্তর

বেয়াড়া: (৪) বিশ্রী। 'রামতারণ মুখুজ্যে বললেন, তোমাদের যতসব বেয়াড়া আবদার।' পরশুরাম

বুজরুকি: (৩) ভাঁওতা। 'ঐ আর একটি অতিকায় ধাপ্পা, বিরাট বুজরুকি।' বুদ্ধদেব বসু

উৎকর্ণ: (৪) শোনার জন্য ব্যাকুল। 'গায়ের রক্ত উৎকর্ণ হয়ে আছে কখন তার একটি শব্দ শোনে।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বেঘোরে: (২) অসহায় অবস্থায়। 'যদি যা-তা খাস, তা হলে স্রেফ হিল ডাইরিয়া হয়ে বেঘোরে মারা যাবি।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীঘর: (৪) কারাগার, অর্থাৎ জেলখানা। 'চাকরি তো যাবেই, সম্ভবত শ্রীঘর বাসও হবে।' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) উপরের বলটির সাইজ় আলাদা। (২) চুলের রং আলাদা। (৩) বাঁ হাতের কব্জির ব্যান্ডের সাইজ় ছোট। (৪) জার্সির কলারের রং আলাদা। (৫) বুকের লোগো (logo) অন্য রকম। (৬) ডান পায়ের মোজার ডিজ়াইন আলাদা। (৭) একটি দাঁত নেই। (৮) প্যান্টের ডিজ়াইন পালটে গিয়েছে।

শব্দসন্ধান

সংকেত: পাশাপাশি

(১) রাজবাড়ির ঘর। (৪) যে দল পরিচালনা করে। (৬) যার নাম — তার নাম মুড়ি। (৮) অন্ধকার। (১০) পদ্ম। (১১) অদ্ভুত ও ভয়ংকর। (১২) লেখকের বড় হাতিয়ার। (১৩) যে মেয়ে মালা বা ফুল জোগায়। (১৫) হাতছাড়া। (১৭) ছোট বাঁদর। (১৮) বেতগাছ। (১৯) উপায়, সমাধান। (২০) আয়ত অর্থাৎ টানা চোখ যাঁর, দুর্গা। (২১) দিশা, মুক্তির উপায়।

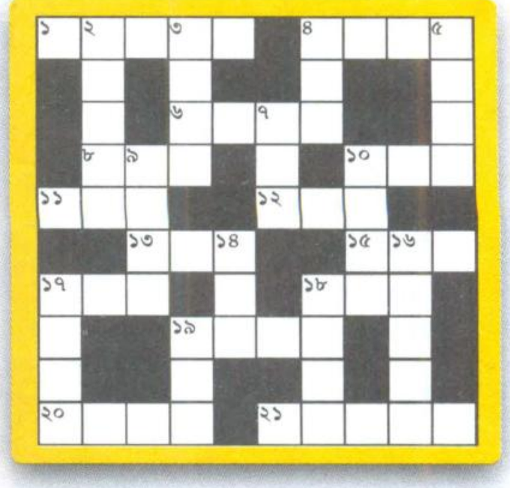

সংকেত: উপর-নীচ

(২) ভয়ানক, মারাত্মক। (৩) নোংরা ব্যবহার বা চালচলন। (৪) দ্বার, ফটক। (৫) তির-ধনুক দিয়ে যে লড়াই করে। (৭) চিন্তাশীল, বেশি কল্পনা করে এমন। (৯) নিষ্পত্তি। (১০) সম্মিলিত। (১৪) নীল রং বা নীলের আভা। (১৬) সাদা রঙের ছোট সুগন্ধি ফুল বিশেষ। (১৭) ফন্দিবাজ। (১৮) নিজেকে সামলাতে পারে না এমন, অসাবধান। (১৯) মাছের মতো সুন্দর নয়নযুক্তা।

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

অ	সা	ব	ধা	ন		গো	রা	চাঁ	দ
	ধ্য		ব			প			ল
	সা		মা	তৃ	হী	ন			ব
	ধ	র	ন		র		প	ঙ্কি	ল
শ্রী	না	থ			ক	ঠো	র		
		যা	ত	না			ব	রা	ত
সু	মি	ত্রা		বি		প	শ	ম	
র			এ	ক	হা	রা		ধ	
লো			ক			জ		নু	
ক	ল	কা	তা		ভ	য়	ং	ক	র

নানা রঙের রামধনু

প্রশ্নের উৎসবে

কুইজ় এখন এমন এক জমজমাট প্রতিযোগিতা যে, ভিড় উপচে পড়ে। কুইজ় ম্যানিয়াক সোসাইটি এবং বারাসাত রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অ্যানুয়াল কুইজ় কনটেস্ট। এই কুইজ় ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ। বিদ্যাসাগর মঞ্চে সকাল ১০ টা থেকে শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী, তারা নাম দিতেও পারবে।

এই কুইজ় প্রতিযোগিতায় দুই সদস্যের এক-একটি দল যোগ দিতে পারবে বলে জানিয়েছেন এই দুই সংস্থার কর্মকর্তারা। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় যেমন যোগ দিতে পারবে, তেমনই অন্য সকলের অংশগ্রহণের জন্যও খোলা থাকবে চমৎকার কুইজ় প্রতিযোগিতার দরজা। নাম দিতে চাইলে যোগাযোগ করতে হবে পীযূষ এবং সরফরাজ়ের সঙ্গে।

ই-মেল: quiz_maniacssociety@yahoo.co.in

চমকদার ট্যালেন্ট হান্ট

প্রায় প্রতিটি চ্যানেলেই চলছে নানারকমের ট্যালেন্ট হান্ট। আর এই ইভেন্টে একটি নতুন সংযোজন রিন 'মেরা স্টার সুপার স্টার'। পাঁচ থেকে চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে। কলকাতাসহ পুরো পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১২৫টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা 'কলকাতা ফাইনাল'-এ অংশগ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন স্কুলের প্রধানশিক্ষক, প্রধানশিক্ষিকা, আর্ট শিক্ষক, আর্ট শিক্ষিকা এবং স্কুল কো-অর্ডিনেটর প্রতিটি স্কুল থেকে সেরা ট্যালেন্টটিকে বেছে নেন। বাছাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে ৬ অগস্ট থেকে ৮ অগস্ট এই তিন দিন ধরে অডিশন হয়ে গেল ঢাকুরিয়ার চিলড্রেন'স লিট্‌ল থিয়েটারে। বিজয়ী পাবে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্কলারশিপ। সেপ্টেম্বর মাসে এই ট্যালেন্ট হান্ট দেখা যাবে স্টার প্লাসে সন্ধে সাড়েসাতটায়।

বই

এক কুড়ি ভূত

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

শৈশব প্রকাশন

১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট

কলকাতা- ৭০০ ০০৯

দাম: ৫০ টাকা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের গল্প পড়তে পাওয়া যাবে এই সংকলনটিতে। প্রচ্ছদটি আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

ভূত পেতনির ১০০ গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও পুণ্ডরীক চক্রবর্তী সম্পাদিত

নির্মল বুক এজেন্সি

৮৯ মহাত্মা গাঁধী রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৭

দাম: ১০০ টাকা

যে-কোনও দেশের বেশির ভাগ মানুষের কাছে ভূতের গল্প অতি প্রিয় বিষয়। একসঙ্গে ১০০টি ভূতের গল্প হাতে পাওয়া গেলে তো কথাই নেই। তাও আবার হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো লেখকদের লেখা।

এক কুড়ি ছড়া

দীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

শৈশব প্রকাশন

১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট

কলকাতা- ৭০০ ০০৯

দাম: ২৫ টাকা

ছোটদের জন্য ছড়ার সংকলন। নিঃসন্দেহে ভাল প্রচেষ্টা। এই সংকলনটিতে আছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখের লেখা সুন্দর সব ছড়া।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬ সেপ্টেম্বর ৮৭তম জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নির্বাচিত রচনা ৩৫০

জনপদবধূ ও অন্যান্য উপন্যাস ১৩০

বন্দরে বন্দরে (বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত/৫ম সং) ৫০

অস্তি গোদাবরী তীরে ৭০

পটভূমি সমুদ্র (৩য় সংস্করণ) ১০০

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী : জীবন-আলেখ্য ৮০

প্রকাশক : পুনশ্চ, মিত্র ও ঘোষ, সাহিত্যবিহার, এম. সি. সরকার

যোগাযোগ : শচীন্দ্রনাথ সাহিত্য সংসদ ✆ ২৪৭৯-৬১৬৩

পাতাজোড়া রঙিন ছবিসহ দারুণ মজার গল্প

টুনটুনির গল্প

দাম : ৪০ টাকা • উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পান্তা বুড়ি

দাম : ৩৫ টাকা • যোগীন্দ্রনাথ সরকার

হেসোরাম হুঁসিয়ারের ডায়েরী

দাম : ৩০ টাকা • সুকুমার রায়

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস • ফোন: ২২৪৪-৫৯২৪, ২২২৭-২৩৩৬

পাবেন : দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড, আদি নাথ ব্রাদার্স, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, সর্বোদয়

সহজ কিস্তিতে, স্বল্প ব্যয়ে পূজোয়/বইমেলায় নিজের লেখা বই প্রকাশ করুন, বিশ্বস্যতার সঙ্গে পাঠকমহলে সুপরিচিত হন।

ভবিষ্যৎ : ৯৮৩১১১২০৯৯

পাণ্ডুলিপি : ৯৪৩৩৬০৬৬৩৮

১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

কুসংস্কার, ভণ্ডামি, ভয়ঙ্কর জ্যোতিষী, ধর্মে বিজ্ঞান, ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন, নারী কি হরিলুটের বাতাসা জানতে হলে আজই পড়ুন

অমৃত লাল বিশ্বাসের

লোকজীবন ঃ যুক্তিবাদ ও প্রতারণা

৫০

ভবিষ্যৎ : ৯৮৩১১১২০৯৯

১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

পুরো নাম: আর্চিবল্ড অ্যান্ড্রুজ।

কে এই আর্চি: এক কথায় বলতে গেলে আর্চি কিশোরদের দারুণ বন্ধু। বয়স সতেরো বছর। রিভারডেল হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র সে। লাল চুলের এই ছেলেটি ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। খেলাধুলো, বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ছাড়াও আর্চির আর-একটি হবি হল, ভিডিও গেম।

প্রথম প্রকাশ: ১৯৪১ সালের ২২ ডিসেম্বর পেপ কমিক্সের ২২ নম্বর সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় এই কমিক্স।

আর্চিকে নিয়ে আরও তথ্য

- ✓ প্রথম গল্পে আর্চির নাম ছিল 'চিক'।
- ✓ আর্চি কমিক্সে দু'টি কুকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। লিটল আর্চিতে আর্চির পোষা কুকুরের নাম 'স্পটি'। পরে আর্চির সঙ্গে আর-একটি পোষা কুকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার নাম ছিল 'রেড'।
- ✓ আর্চি গিটার বাজাতে পারে। 'আর্চিস' ব্যান্ডের সে লিড ভোকালিস্ট।পকেটমানির জন্য আর্চিকে বিভিন্ন কাজ করতে দেখা গিয়েছে। সুপার মার্কেটের ব্যাগবয়, ওয়েটার, গল্ফ ক্যাডি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সেল্সবয়— নানান কাজ করে আর্চি।
- ✓ আর্চির বান্ধবী ভেরোনিকা লজের বাড়িতে একটা নিজস্ব এ টি এম মেশিন আছে।

ছোটদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার কথা ভেবে মার্কিন কিশোর-কিশোরীদের জীবন নিয়ে লেখা হয় আর্চি কমিক্সের গল্প। জানিয়েছেন অভিজিৎ সুকুল

মার্কিন সৈন্যদের মধ্যেও জনপ্রিয় আর্চি

স্রষ্টা: বব মন্তানা। ১৯৭৫ সালে ববের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সময়ে আর্চি কমিক্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ড্যান ডিকার্লো, স্ট্যান গোল্ডবার্গের মতো শিল্পীর নামও। আর্চি কমিক্সের লেখক হিসেবে উল্লেখ করা যায় ভিক ব্লুম এবং ক্রেগ বোল্ডম্যানের কথা।

সৃষ্টির নেপথ্যে: আর্চির মতো কমিক্সের আইডিয়া প্রথম মাথায় আসে পেপ কমিক্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জন গোল্ডওয়াটারের মাথায়। সে সময় মার্কিন কমিক্সের বাজারে রমরমা ছিল সুপারম্যান, ব্যাটম্যান, ক্যাপ্টেন মার্ভেল, ওয়ান্ডার উইমেনদের মতো সুপার হিরোদের। বাজারে টিকে থাকতে গোল্ডওয়াটার নতুন ধরনের কোনও বিষয়বস্তু নিয়ে কমিক্সের কথা ভাবেন। অল্প বয়সি, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে মার্কিন ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে কমিক্সের গল্প লেখার কথা ভাবেন তিনি। নিউ ইয়র্কের টিচার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে পড়বার সময় গোল্ডওয়াটারের বন্ধু ছিলেন অ্যান্ডি হার্ডি। মূলত তাঁর আদলে এবং মিকি রুনি মুভি সিরিজের আদলে গড়ে তোলেন আর্চিকে। আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হয় বব মন্তানাকে।

অন্য চরিত্রেরা: আর্চি কমিক্সের দু'টি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল আর্চির দুই সহপাঠিনী এলিজাবেথ বেটি কুপার এবং ভেরোনিকা লজ। সাদাসিধে বেটি এবং ধনীর দুলালি ভেরোনিকার মধ্যে আর্চিকে নিয়ে একটা ঠান্ডা লড়াই চলে। এ ছাড়াও আছে ফরসাইথ পেন্ডলটন জোন্স ওরফে জাগহেড জোন্স। পেটুক জাগহেড আর্চির সেরা বন্ধু। আর আছে রেজিনাল্ড রেগি ম্যান্টল। তার রসবোধের তারিফ করতেই হয়। এ ছাড়াও আছে রিভারডেল হাই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রিন্সিপাল ওয়াল্ডো ওয়েদারবি, অঙ্ক/ইংরেজির শিক্ষিকা জেরাল্ডিন গ্রান্ডি, বিজ্ঞানশিক্ষক প্রোফেসর ফ্লুটস্লুট প্রমুখ। আর্চির সঙ্গে অম্লমধুর সম্পর্ক ভেরোনিকার ধনকুবের বাবা হিরাম লজও হাসির হর্‌রা নিয়ে হাজির হন মাঝেমধ্যেই।

- ✓ মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় আর্চি কমিক্স। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে আর্চি কমিক্স বিলিও করা হয়।

ছবি: সঞ্জীবন বসু

দার্জিলিং জিমখানা ক্লাবের শতবর্ষে ক্লাবকর্তারা ঘোড়দৌড় ফিরিয়ে আনতে চান। লিখেছেন **অনিতা দত্ত**

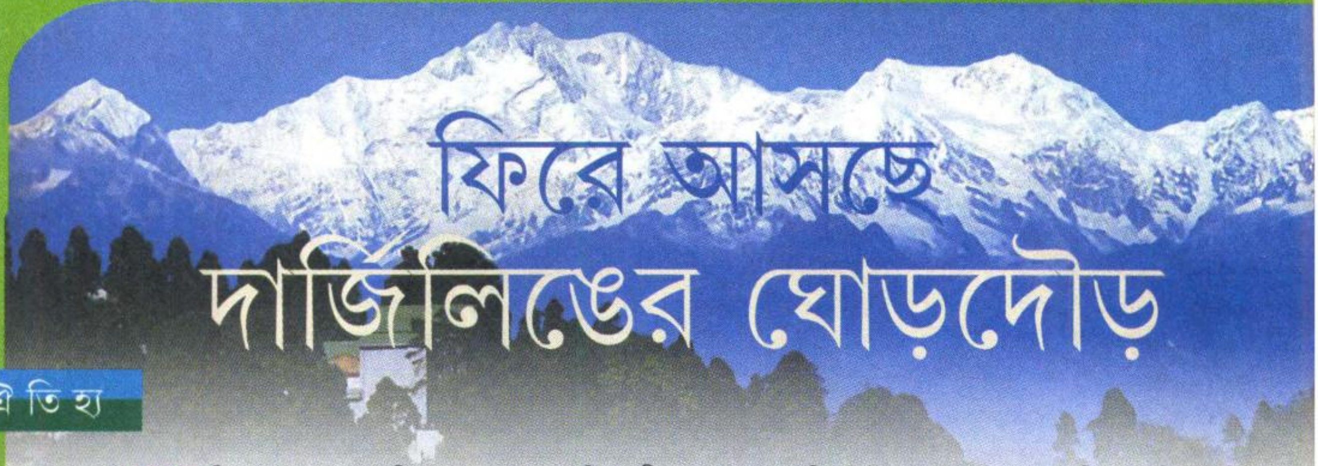

ফিরে আসছে দার্জিলিঙের ঘোড়দৌড়

ঐতিহ্য

সেদিন স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে অঘোষিত ছুটি। সেদিন যে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গভর্নর'স কাপের খেলা। শহরের মানুষ তাই মাঠমুখো। ধীরে-ধীরে ভরে উঠছে কাঠের গ্যালারি। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দর্শকদের মধ্যে আছেন আই পি এস, আই সি এস এবং সশস্ত্র বাহিনীর আধিকারিকরা। আছেন বিভিন্ন প্রদেশের রাজা-মহারাজা, আর ব্রিটিশ কর্তারা। এমনকী উপস্থিত গভর্নর 'ছোট লাট' নিজেও। মাঠে ব্যাগপাইপার, বিউগল ও ড্রামস নিয়ে সুসজ্জিত পুলিশ ব্যান্ডের দলও তৈরি। ব্যান্ডের বাজনা শেষ হলেই শুরু হয়ে যাবে ঘোড়দৌড়ের সেরা আকর্ষণ গভর্নর'স কাপ। সবচেয়ে ছোট তো বটেই, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু এই ঘোড়দৌড়ের মাঠটি বাড়ির কাছেই। দার্জিলিং পাহাড়ের লেবং-এ।

সে এক দিন ছিল। ইউরোপিয়ানরা তাঁদের সেকেন্ড হোমের আদলে গড়ে তুলেছিলেন দার্জিলিংকে। একটু-একটু করে তাঁরা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে তুলেছিলেন শৈলশহরটিকে। ১৯০৯ সালে তৈরি হল জিমখানা ক্লাব। ক্লাবের দৌলতে খুব কম সময়েই মানুষের আনন্দের আর অবসর বিনোদনের অঙ্গ হয়ে উঠল ঘোড়দৌড়। পাহাড়ের উপর লেবংয়ে একচিলতে সমতলে সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠ উসকে দেয় অনেক হারানো স্মৃতি।

প্রতি গ্রীষ্মে ও শরতে আরামদায়ক আবহাওয়ায় বসত ঘোড়দৌড়ের আসর। খেলা হত ফি-হপ্তায় বুধবার ও শনিবার। সব মিলিয়ে বছরে কুড়ি থেকে বাইশ দিন। রেসের জন্য ঘোড়া কেনা হত তিব্বত থেকে। পরে ঘোড়া আনা হত মণিপুর থেকেও। আর এই ঘোড়াগুলো ছিল টাট্টু ঘোড়া। এদের পোশাকি নাম ছিল 'পনি'। ভুটানের তখনকার প্রধানমন্ত্রী এস কে দরজি, ইউসুফ মির্জা, নেপালের তখনকার প্রধানমন্ত্রী জংবাহাদুর রানার বংশধর কর্নেল গোবিন্দ জংবাহাদুরদের নিজস্ব রেসের ঘোড়া ছিল। রেস শেষ হলে তারা ফিরে যেত ক্লাবের নিজস্ব আস্তাবলে। সেই সময় ক্লাব হাউসের পাশের আস্তাবলে রাখা হত ৫০-৬০টি ঘোড়া। প্রশিক্ষণ দেওয়া যে জকিরা সেজেগুজে খেলায় অংশ নিতেন, তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন স্থানীয় মানুষ। ট্রেনারের কাজটিও করতেন তাঁরাই। টাট্টুর পিঠে চামড়ার জিন, রংচঙে পোশাক পরা জকির দু' হাতে আঁকড়ে ধরা লাগাম, ফ্ল্যাগশিপ, ঘোড়ার পিঠে আছড়ে পড়া চাবুক, একে অন্যকে টেক্কা দিতে প্রাণপণে ছুটতে থাকা দৌড়বাজের দল, পাহাড়ঘেরা শীতের দেশে হলুদ রোদ মেখে ছড়িয়ে থাকা ছোট্ট কাঠের গ্যালারি, তার কোনায়-কোনায় ছড়িয়ে পড়া উত্তেজনা, দর্শকের আসন থেকে পছন্দের ঘোড়াটি নিয়ে মুহুর্মুহু চিৎকার। গভর্নর'স কাপ ছাড়াও খেলা হত স্টুয়ার্ট কাপ, ওকলে মেমোরিয়াল কাপ, মহারাজা বর্ধমান কাপ। এ ছাড়া নাজারগঞ্জের রাজার পক্ষ থেকেও কাপ দেওয়া হত। কখনও-কখনও ক্লাবের তরফ থেকেও কাপ দেওয়া হত। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে ১৯৪০ থেকে স্বাধীনতার পর ১৯৫০ পর্যন্ত বুকি হাউজ দেখাশোনার দায়িত্ব সামলেছেন ক্লাবের প্রাক্তন সেক্রেটারি অজিতকুমার ঘোষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে রেসের ঘোড়া আনাও কঠিন হয়ে পড়ে। ঘোড়ার অভাবে সাপ্তাহিক রেসের সংখ্যাও কমে যায়। প্রথম দিকে প্রতিদিন রেস হত ন'বার, পরে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ছ'বারে।

বিধানচন্দ্র রায় রেসে লটারির নিয়ম বন্ধ করে দেন। হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ফের লটারি চালু করার উদ্যোগ নিলেও, সরকারি আইনকানুন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবে ক্লাবের লোকশান বাড়তে থাকে। তাই ক্লাবের পক্ষে এই ঘোড়দৌড় চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯২৫ সালে যে ঘোড়দৌড়ের শুরু, তা শেষ হয় ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর।

এবার দার্জিলিং জিমখানা ক্লাব কর্তৃপক্ষ, ক্লাবের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে সেই ঘোড়দৌড় ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন।

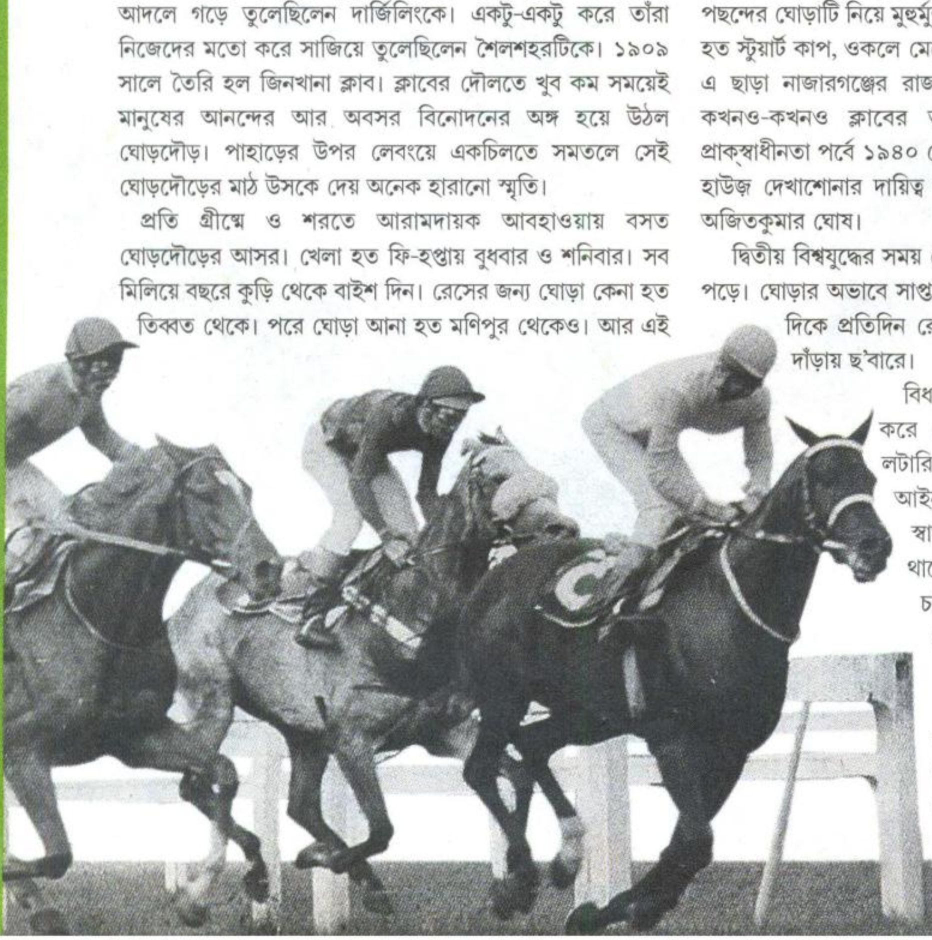

প্রতিদিন এক ঘন্টাই যথেষ্ট।

6 লাখেরও বেশি মানুষ লাভবান হয়েছেন।

আর আপনি ?

শুধু বাংলা জানলেই চলবে

ইংরেজি

শিখুন

সহজেই ইংরেজি বলুন

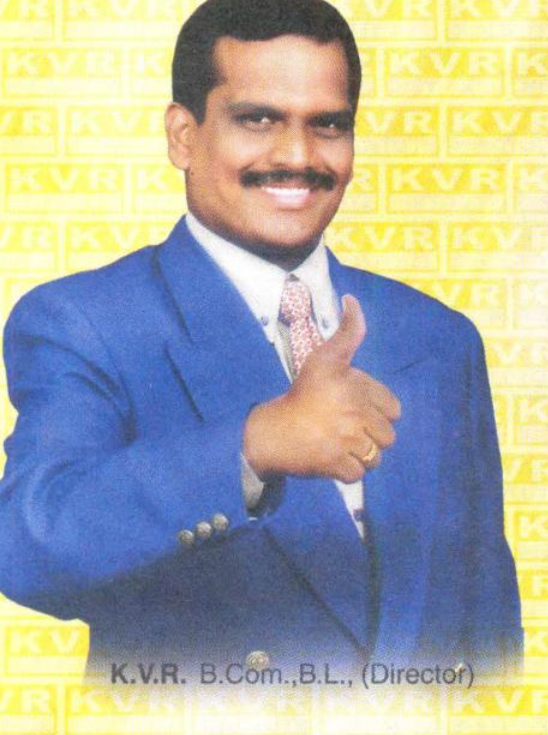

K.V.R. B.Com.,B.L., (Director)

আপনি আপনার ঘরে বসে অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই প্রতিদিন ১ ঘন্টা নিজে নিজে শিখলেই যথেষ্ট। আপনি সহজেই ইংরেজি শিখে নিতে পারবেন। আমাদের কোর্স বিশেষরূপে সোজা উদাহরণ সহযোগে সহজ ভাবে তৈরি। এই জন্য নিঃসন্দেহে আপনি ইংরেজিতে সহজেই কথা বলতে পারবেন। এই কোর্সের বর্তমান খরচ **500** টাকা। নীচের কুপন পূরণ করে আমাদের কাছে পাঠান। আপনার পোস্টম্যানের কাছে টাকা দিয়ে কোর্স নিয়ে নিন। এর পরে আর একটি কোর্স আছে যা চার মাসের কোর্স। এর খরচ অনেক কম, নামমাত্র। ইচ্ছে হলে এই কোর্স নিতে পারেন তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

বিনামূল্যে
১০০ টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স
(সহজ ইংরেজিতে)

6 লাখেরও বেশি মানুষের শেখা ইংরেজি কোর্স।

এক দিনের ইংরেজি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছেন কে.ভি.আর. (পুরস্কারবিজয়ী)

এই কুপন পূরণ করে পাঠান

3843

SINCE 1990

KVR INSTITUTE
AWARD WINNER

বিনামূল্যে
১০০ টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স
(সহজ ইংরেজিতে)

New No.203(BEN), Habibullah Road, T.Nagar, Chennai - 600 017.

আমাকে কে.ভি.আর. (**1** মাসের) ইংরেজি কোর্স এবং মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স ইত্যাদি ডাকে পাঠান। আমি পোস্টম্যানকে **500/-** টাকা দিয়ে দ্রুত বই সংগ্রহ করে নেব।

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানা বড় হাতের ইংরেজি হরফে লিখুন।

Name: ....

Address: ....

....

.... Pin Code:

* SERVICE TAX INCLUDED

কুম্বলের পরেই ম্যাচউইনার হিসেবে যাঁকে ধরা হচ্ছে, তাঁর নাম শ্রীশান্ত। তাঁকে ঘিরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে বাজিমাত করার কথা ভাবছেন চ্যাপেল। লিখেছেন **অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়**

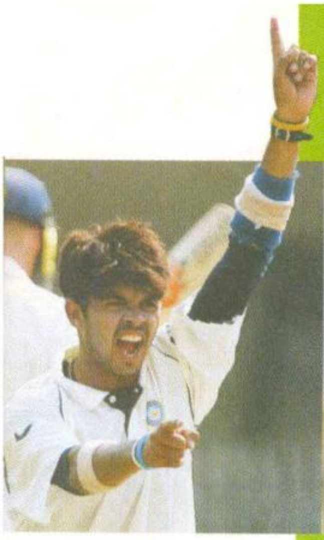

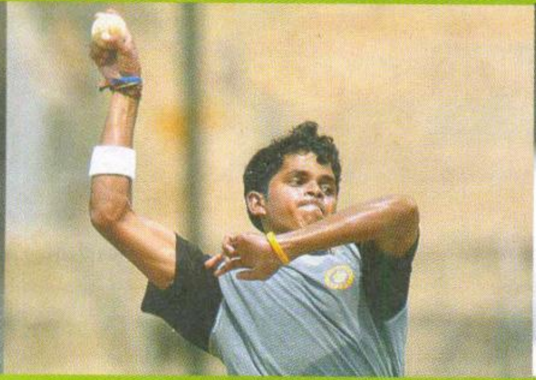

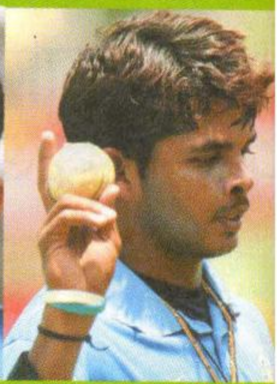

'প্রিন্স অফ হ্যাটট্রিক' শ্রীশান্ত

ভারতের এই সম্ভাবনাময় মিডিয়াম পেস বোলারের ডাকনাম গোপু, পুরো নাম শান্তাকুমারণ শ্রীশান্ত। ২০০৫ সালের শেষের দিকে অভিষেকম্যাচেই সকলের নজর কাড়েন কেরলের এই ক্রিকেটার। অভিষেকের সময়ই তিনি বলেছিলেন, "আমি ভীষণ খুশি। দেশের প্রতিনিধি হিসেবে খেলাটা আমার কাছে এক বিশেষ মুহূর্ত। আমি এই মুহূর্তটিকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই।"

সম্প্রতি তিনি পরবর্তী বিশ্বকাপ খেলতে চান বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। যদিও তিনি প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে খুব একটা চিন্তিত নন। কারণ, বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্বাচকদের হাতেই। আর খেলোয়াড়দের হাতের একমাত্র 'অস্ত্র' হল ভাল পারফরম্যান্স।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সব কিছুই পালটে যায়। স্বাভাবিকভাবেই শ্রীশান্তের ইচ্ছেও এই সব কিছুর উর্ধ্বে নয়। ভাবতে অবাক লাগে, ভারতের এই দুরন্ত পেস বোলারটি প্রথম জীবনে ছিলেন লেগস্পিনার এবং বড় হয়ে অনিল কুম্বলে হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তাঁর দাদার উৎসাহ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাঁর ইয়র্কার দেওয়ার অভ্যেস তাঁকে পেস বোলিংয়ে নিয়ে আসে। পড়াশোনা করেছেন সাইকোলজি নিয়ে এবং ইংরেজি, হিন্দি, তামিল ছাড়াও মলয়ালম ভাষাতেও তিনি সমান দক্ষ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, তিনি একজন বিখ্যাত ব্রেক-ড্যান্সার। এমনকী, নাচে তাঁর জাতীয় স্তরের পদকও আছে। অর্থাৎ, তিনি যদি ক্রিকেটে না এসে নাচকেই পেশা হিসেবে নিতেন, তা হলে হয়তো প্রভু দেবা, জাভেদ জাফরিদের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর নামও আমরা একই সঙ্গে উচ্চারণ করতাম।

জীবনের প্রথম ব্রেক আসে চেন্নাইয়ের এম আর এফ পেস ফাউন্ডেশনে নির্বাচিত হওয়ার পর। এর পর আর তাঁকে ঘুরে তাকাতে হয়নি। কারণ, ২০০৪-এ রঞ্জি ট্রোফিতে তিনি হিমাচল প্রদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন। সৌরভের 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'-র মতো তাঁর নামও এখন 'প্রিন্স অফ হ্যাটট্রিক'। ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে চ্যালেঞ্জার ট্রোফিতে ইন্ডিয়া বি টিমে সুযোগ পান। এই ট্রোফিতে তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে প্রথম একদিনের ম্যাচে তাঁকে সুযোগ করে দেয়। টেস্টে অভিষেক হয় আরও দু' মাস পরে ২০০৬-এর জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

এখনও পর্যন্ত তিনি পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন, উইকেট পেয়েছেন ১৯টি। বোলিং গড় হল ২৯.৭৮ এবং সেরা বোলিং পারফরম্যান্স ৭০ রানে চার উইকেট। একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ১৮টি, উইকেট পেয়েছেন ২৪টি। বোলিং গড় হল ৩৬.২০। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর ৫৫ রানে ছ' উইকেট হল যে-কোনও ভারতীয় পেস বোলারের সেরা পরিসংখ্যান। ঘরোয়া ক্রিকেটেও তাঁর পারফরম্যান্স বেশ উজ্জ্বল। অর্থাৎ ২৮টি ম্যাচে তিনি উইকেট পেয়েছেন ৮১টি। সেরা পারফরম্যান্স ৫৭ রানে পাঁচটি উইকেট। অতএব ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এবং পেস বোলিংয়ের আদর্শ পিচে শ্রীশান্ত বিপক্ষ দলের যে-কোনও খেলোয়াড়ের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন। আর কপিলদেব, শ্রীনাথদের সুযোগ্য উত্তরসূরি এই পেস বোলারটি হয়তো বিশ্বক্রিকেটে ভারতীয় পেস বোলারদের ব্যর্থতা কিছুটা হলেও ঘোচাতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক অসাধ্য কাজও চোখের নিমেষে করে ফেলতে পারেন, তার সাক্ষী ২০ অগস্টের কলম্বো। লিখেছেন ভাস্বতী ঘোষ

(বাঁ দিক থেকে) মৌমা দাস, পৌলমী ঘটক, নন্দিতা সাহা, কস্তুরী চক্রবর্তী

সাফ গেম্‌সের সোনার মেয়েরা

টপ স্পিন

সাফ গেমসে এবার ভারতকে সোনা এনে দিয়েছে চার বাঙালি মেয়ের দল! অবশ্য এ নিয়ে বিশেষ মাতামাতির সুযোগ নেই। কাগজের পাতা থেকে বাঙালি আড্ডা, ক্রিকেট বা ফুটবলের মতো বড় ব্যাপার ছেড়ে এই সব ছোটখাটো সাফল্য নিয়ে আমরা খুব একটা আলোচনা করি না বা এই সাফল্যের পিছনে যে বিরাট লড়াইটা আছে, তাকে অনুভব করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যদি থাকত, তা হলে চার বাঙালি 'ধন্যি মেয়ে'র টেব্‌ল টেনিসে দলগত বিভাগের সোনাই এখন সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হত। অবশ্য এই মেয়েদের কেরামতি আমরা আগেও অনেকবার দেখেছি। টেব্‌ল টেনিসে পৌলমীর পারফেক্ট শট বা মৌমার ম্যাজিক নতুন কিছু নয়। তবে এবার দলগতভাবে ভারতের হয়ে সোনাজয় আরও একটু বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এবার প্রথম থেকেই অবশ্য পৌলমী ঘটক, মৌমা দাস, নন্দিতা সাহা এবং কস্তুরী চক্রবর্তীর ভারতীয় টেব্‌ল টেনিস দলে আত্মবিশ্বাস ছিল দেখার মতো। তবু প্রস্তুতি যতই ভাল হোক না কেন, যতক্ষণ 'শেষ হাসি' হাসাটা বাকি, উত্তেজনার পারদ যেন ক্রমশ চড়তেই থাকে। আর এরকম 'মহাযুদ্ধে' যদি বিপরীত পক্ষ পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কা হলে তো কথাই নেই। সাফ গেমসে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হওয়ার আগে সেদিন ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। তবে পাকিস্তানের পক্ষে এই সব ধন্যি মেয়েদের কাবু করা সত্যিই মুশকিল! তাই বেশ সহজ এবং সাবলীলভাবেই ভারতকে যে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছেন এই মেয়েরা, তেমন দাবি করলে বোধ হয় খুব একটা বাড়াবাড়ি হবে না! তবে ফাইনালে লড়াইটা কিন্তু বেশ জমে গিয়েছিল। ভারতীয় দলে লড়াইয়ের মনোভাব তুঙ্গে থাকলেও, তাঁদের সমর্থনে গলা ফাটানোর লোকের অভাব ছিল বইকী! নিজের দেশে যে-কোনও ফাইনাল খেলারই মস্ত সুবিধে হল দর্শকের সমর্থন, চেনা আবহাওয়ার কারণে অনেক ঠান্ডা মাথায় খেলা যায়। এরকম অবস্থায় শ্রীলঙ্কা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কিছু সুবিধে যে পেয়েছিল, সে কথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবে না। এই অবস্থায় শ্রীলঙ্কার হাত থেকে ৩-২ এ সোনা ছিনিয়ে নেওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশের ধন্যি মেয়েরা যে-কোনও দুঃসাধ্য বা প্রায় অসাধ্য কাজও যে চোখের নিমেষে করে ফেলতে পারেন, তার সাক্ষী ২০ অগস্টের কলম্বো।

আমাদের দেশে ক্রিকেট বা ফুটবল ছাড়া অন্য সব খেলা নিয়ে যে মাতামাতি বেশ কম, তা নিয়ে খেলোয়াড়দের নিত্য অভিযোগ এখন গা-সওয়া। আর মাতামাতি তো নিতান্ত বাহুল্য, যেখানে খেলায় উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো পেতে দিন থেকে রাত লড়াই করতে হয়। প্রভাবশালী খেলোয়াড়দের প্রতিপত্তি, কোচের অভাব, বিদেশি প্রশিক্ষণ নেওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সামর্থ্যের অভাব সবই এই লড়াইয়ের টুকরো প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এসব লড়াইয়ের ফাঁকেই, সাফ গেমসের মতো বড় লড়াইয়ের জন্য নিজেদের কখন যে প্রস্তুত করে ফেলেন এই সব ধন্যি মেয়েরা, তা আমরা জানতেও পারি না। নিজের দেশের চূড়ান্ত সফল প্রতিনিধি পৌলমীরা যখন ঘরে ফিরবেন, আমরা হয়তো তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে এয়ারপোর্টেও পৌঁছব না। কিন্তু কোনও কিছুর আশা না করেই আবার, আরও অনেক বার এই মেয়েরা তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় রাখবেন। দেশ এবং দশকে গর্বিত করার আরও একটা সুযোগ করে দেবেন। আর আমরা কেউ-কেউ অনুপ্রাণিত হব, হয়তো খেলায় নয়, জীবনের বিভিন্ন যুদ্ধে লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে। সাফ গেম্‌সে জয়ের বাইরেও ধন্যি মেয়েদের এও এক বড় দৃষ্টান্ত!

এবার টেনিস র‍্যাকেট তুলে রাখবেন মার্টিনা

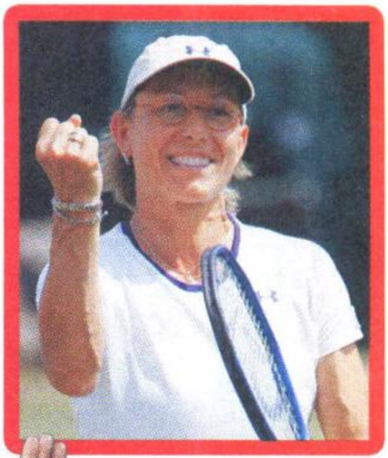

আর নয়। এবার সত্যি-সত্যিই কোর্ট থেকে বিদায় নিতে চলেছেন টেনিসের কিংবদন্তি নায়িকা মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। আগামী ইউ এস ওপেনের পর টেনিস র‍্যাকেট তুলে রাখবেন তিনি। টেনিস জীবনে ৫৮টি গ্র্যান্ডস্লাম জিতেছেন। শুধু উইম্বলডন থেকেই জিতেছেন ২০টি খেতাব। এর মধ্যে ন' বার সিঙ্গল্‌স চ্যাম্পিয়ন। ডাবল্‌সে জয় পেয়েছেন সাত বার এবং মিক্সড ডাবল্‌সে চার বার। এর আগে ১৯৯৪ সালে পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নিয়েও পরে অবসর ভেঙে আবার কোর্টে ফিরে আসেন। তিনি বলেছেন, "যথেষ্ট হয়েছে। এবার আমি থামতে চাই।" ইউ এস ওপেনে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন মার্টিনা।

সবচেয়ে বেশি আয় শুমাখারের

ফর্মুলা ওয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে এবার বেশ ভাল জায়গায় আছেন জার্মান কার ড্রাইভার মাইকেল শুমাখার। গত বছর চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও, আয়ের হিসেবে কিন্তু সকলকে পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। ৩৪৪ কোটি টাকা উপার্জন করে তিনিই গত বছরের সবচেয়ে ধনী খেলোয়াড় হয়েছেন। ১২৯ কোটি টাকা উপার্জন করে তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন আর-এক কার ড্রাইভার রোসি। ফুটবল তো খুবই জনপ্রিয় খেলা। আয়ের দিক থেকে বিশ্বের তৃতীয় ধনী খেলোয়াড় হয়েছেন ফুটবলার রোনাল্ডিনহো। তাঁর আয় ২ কোটি ৯১ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৯৫ কোটি টাকা। আর টেনিসের গ্ল্যামার গার্ল শারাপোভা? তিনি কিন্তু রোনাল্ডিনহোর পিছনে। ৯০ কোটি টাকা উপার্জন করে গত বছরের আয়ের তালিকায় তিনি পেয়েছেন চতুর্থ স্থান।

রোনাল্ডিনহো অন্য ভূমিকায়

জার্মান বিশ্বকাপ থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে রোনাল্ডিনহোকে। তবে বিশ্বকাপে ব্যর্থ হলেও, ব্রাজিলের এই তারকা ফুটবলারটিকে বার্সেলোনা থেকে দলে পেতে ইতিমধ্যে আকাশছোঁয়া দর হেঁকেছে ইতালির এসি মিলান ক্লাব। তারা ১০ কোটি ইউরো বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা দিয়েও রোনাল্ডিনহোকে পেতে চায়। এদিকে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র দূরীকরণ এবং শান্তি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের 'মুখপাত্র' ও 'দূত' নিযুক্ত হওয়ায় এবার অন্য এক ভূমিকায় দেখা যাবে রোনাল্ডিনহোকে। আগামী অক্টোবরে ইউ এন গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ সামিটে প্রথম ভাষণ দেবেন তিনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু'র কাছ থেকেও সম্প্রতি বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছেন এই ব্রাজিলীয় তারকা।

ম্যাকগ্রা দলে ফিরছেন

বেশ কিছুদিন পর আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন গ্লেন ম্যাকগ্রা। পাঁচশো উইকেটের গণ্ডি টপকানো এই ফাস্ট বোলারটিকে সম্ভবত আসন্ন আই সি সি ট্রোফিতেই অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে আবার মাঠে বল করতে দেখা যাবে। আই সি সি ট্রোফির জন্য অস্ট্রেলিয়া বোর্ড যে ৩০ জনের দল ঘোষণা করেছে, সেই দলে স্পিডস্টার ম্যাকগ্রাও স্থান পেয়েছেন। বেশ কয়েকজন নতুন মুখের ক্রিকেটারের সঙ্গে ১৪ জনের দলে ম্যাকগ্রার ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। অনেক ব্যাটসম্যানের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া এই বোলারটি চ্যাম্পিয়নস ট্রোফির লড়াইকে অ্যাসেজ সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন।

সেরা সাঁতারুর সম্মান পেলেন সুমন্ত

বাবা রিকশা চালান। মা অন্যের বাড়ির পরিচারিকা। একেবারেই দিন আনি দিন খাই অবস্থা। তবু মনের জেদ অবলম্বন করে সাঁতার কেটে চলেছেন হুগলি জেলার রিষড়ার তরুণ সুমন্ত নাথ। এবারের রাজ্য সাঁতারে সুমন্ত পাঁচটি ইভেন্টে নেমে চারটিতেই নতুন রাজ্য রেকর্ড গড়ে সকলকে চমকে দিয়েছেন। ভেঙেছেন নিজেরই গড়া রাজ্য রেকর্ড। গতবারের মতো এবারও পুরুষ বিভাগের সেরা সাঁতারুর পুরস্কার উঠেছে সুমন্তর হাতে। অর্থের অভাবে অষ্টম শ্রেণির বেশি পড়াশোনা হয়নি। সাঁতারও প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোচ তমাল দাসের চেষ্টায় সুমন্ত হারিয়ে যাননি। ওঁর চোখে এখন আরও বড় সাফল্যের স্বপ্ন।

চন্দন রুদ্র

ANANDAMELA SEPTEMBER 2006 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00